আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর জীবনী

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর জীবনী

দ্বিতীয় সংস্করণ। 18 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলামের চতুর্থ সঠিক পথনির্দেশিত খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর জীবনী

ইসলাম গ্রহণের আগে মক্কায় জীবন

একটি ধন্য জন্ম

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় মহান আল্লাহর ঘর কাবার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 53-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, সমস্ত সাহাবীদের মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর সারাজীবনে, মসজিদগুলির সাথে একটি দৃঢ় বন্ধন ছিল কারণ তিনি জানতেন যে তারা পৃথিবীর সেরা স্থান।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

একটি আশীর্বাদপূর্ণ লালনপালন

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিব, আলী ইবনে আবু তালিবের পিতা, তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। বহু বছর পরে এবং নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কার জনগণের উপর তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দেয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আল আব্বাসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন আবু তালিবকে তার একটি সন্তানকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাহায্য করে। আল আব্বাস, জাফর ইবনে আবু তালিবকে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিবকে নিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 67-68-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিল এবং তাই খুব অল্প বয়স থেকেই মহৎ চরিত্র গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের সঠিক লালন-পালন নিশ্চিত করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে ভালো উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের বিশ্বাস সম্পর্কে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়-স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে ভাল কিছু রেখে যায় যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে চলা

এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, কখনও কোন মূর্তিকে সিজদা করেননি বা পূজা করেননি। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৮২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন এবং নিষ্প্রাণ মূর্তি পূজা করার ক্ষেত্রে তার চারপাশের লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি।

একজনের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ একটি প্রধান কারণ কেন লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যেমন বিচার দিবস। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ এবং স্পষ্ট লক্ষণের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গবাদি পশুর মতো অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়। এই পদ্ধতিতে আচরণ বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে শুধুমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

ইসলামে অন্ধ অনুকরণও অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজায় পাওয়া একটি হাদিস, 4049 নম্বর, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও সত্যই। তার প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকৃতি. এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এটি সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে জয় করে। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে বা বিপরীতে।

সত্যবাদিতা

যেহেতু আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর সকল বিষয়ে সত্যবাদিতা অবলম্বন করেছিলেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নবী হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উত্তর দিলেন যে তিনি প্রথমে তার পিতা আবু তালিবের সাথে আলোচনা করতে চান। কিন্তু পরদিন পিতার সাথে কোন আলোচনা না করেই তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল প্রায় ১০ বছর। এভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সন্তান হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 68-69-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সত্যবাদিতা গ্রহণ করেছিলেন, ইসলামের সত্যতা তাঁর কাছে পেশ করা হলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সত্যবাদিতা অবলম্বন করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন

সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ

এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় জীবন

অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে গোপনে সালাত আদায় করতেন যতক্ষণ না আবু তালিব জানতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবু তালিবকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তার সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে এটি সত্য। এটা প্রমাণিত যে, তিনি তার পুত্র আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন যে, তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ চালিয়ে যেতে, কারণ তিনি তাকে ভালো কিছুর দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 69-70-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু তালিব তার জনগণের প্রতি আনুগত্যের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কিছুটা আন্তরিকতা দেখাতে ব্যর্থ হননি, কারণ তিনি তাকে তার সুরক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি আলীর প্রতি আন্তরিকতা দেখাতে ব্যর্থ হননি। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন.

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে

সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয় । আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

অন্যদের গাইডিং

এমনকি অল্প বয়সেও, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাধ্যমত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মিশনে সাহায্য করেছিলেন। আবু ধার আল গাফারী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এমন একজন ছিলেন যিনি মূর্তি পূজা করেননি এবং ইসলাম গ্রহণ করার আগেও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন। যখন তিনি ইসলামের কথা শুনেছিলেন তখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করতে, গোপনে, কারণ তিনি ইসলামের প্রতি মক্কার অমুসলিমদের ঘৃণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আলী আবু ধারের সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তার এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে একটি গোপন বৈঠক স্থাপনে সহায়তা করেন। ফলে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 71-72-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি

বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন । তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

একটি মন্দ সমাবেশ

যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনায় হিজরত করতে শুরু করলেন মক্কার অমুসলিম নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও মদিনায় হিজরত করবেন। তাই তারা দার আল নাদওয়াতে একটি সভা করেছে, যা মক্কায় মহান আল্লাহর ঘর, কাবার কাছে অবস্থিত। এমনকি শয়তানও বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তাদের সভায় যোগ দেয়। এই সভার সদস্যরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশনকে চূর্ণ করার জন্য কী করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের মতামত পেশ করেছিলেন কিন্তু শয়তান তা প্রত্যাখ্যান করেছিল যতক্ষণ না মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা (সা.) , আবু জাহল, তার মতামত প্রস্তাব. তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিয়ে তাকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোত্রকে বাধা দেবে, প্রতিশোধমূলকভাবে তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে এবং তারা কেবল ঘটনাটি শেষ করার জন্য তাঁর গোত্রকে অর্থ প্রদান করবে। শয়তান এবং এই সভার অন্যান্য সদস্যরা এই মন্দ পরিকল্পনার সাথে একমত হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 152-153-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি

একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা

মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তখন তারা এই অশুভ কাজে নিয়োজিত দলটিকে হুকুম দেয় যে, তারা যেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করে। এবং যখন সে ঘুমাচ্ছিল তখন তাকে আক্রমণ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বিছানায় তাঁর স্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন যাতে তিনি গোপনে হিজরত করতে পারেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তখন তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ সাময়িকভাবে ঘাতকদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্য দিয়ে চলার সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মাথায় ময়লা ঢেলে চলে গেলেন। ঘাতকরা তখনই বুঝতে পেরেছিল যে কী ঘটেছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এলাকা ত্যাগ করার পরে এবং যখন একটি পথচারী তাদের কাছে কী ঘটেছিল তা তাদের জানানো হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 153-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই অলৌকিক ঘটনা মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে যখনই তারা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে, এই বিশ্বাসে যে তিনি তাদের এ থেকে মুক্তির পথ দেবেন, যদিও সেই সময়ে এটি অসম্ভব বলে মনে হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন, এমনকি যদি অসুবিধার পিছনের জ্ঞানগুলি স্পষ্ট না হয়। এটি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যা হয় আশীর্বাদ বা মহান আল্লাহর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করে। একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবনের অগণিত উদাহরণগুলির প্রতিফলন করতে হবে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ ছিল শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য এবং এর বিপরীতে। এটি ঠিক এমনই হয় যখন একজন ব্যক্তি ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খান। যদিও ওষুধটি তিক্ত হলেও তারা এটি গ্রহণ করে বিশ্বাস করে যে এটি তাদের উপকার করবে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে একজন মুসলমান কীভাবে একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারে যার জ্ঞান সীমিত এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নন যে তিক্ত ওষুধ তাদের উপকার করবে এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হবে, যার জ্ঞান অসীম এবং যখন তিনি কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম নির্ধারণ করেন।

একজন মুসলমানের উচিত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, এবং তারপর তার কাছে তাদের সাহায্যের আশা করে সে একজন ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল। যিনি মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবেন, যা এই ঘটনায় নির্দেশিত হয়েছে, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করেন এবং তারপর তাঁর পছন্দের অভিযোগ বা প্রশ্ন না করে তাঁর বিচারে বিশ্বাস করেন।

এই ঘটনাটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (রা.)-এর আন্তরিকতা ও ভালোবাসাকেও তুলে ধরে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

মদিনায় হিজরত

ট্রাস্ট পূরণ করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেখে যান এবং মক্কার অমুসলিমদের মূল্যবান জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার পর তাঁকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন যা তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে জমা করে রেখেছিলেন। তাকে, নিরাপদ রাখার জন্য, সততা এবং বিশ্বস্ততার জন্য তার খ্যাতি ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং গৃহীত হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 155-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

মাইগ্রেশন

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পর, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পূর্ণ করেন, মক্কাবাসীদের জিনিসপত্র তাদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য যা তাঁর কাছে অর্পিত হয়েছিল, আলী রা. তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দিতে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি একাই রওয়ানা হন কোন চড়নকারী প্রাণী ছাড়া এবং যাত্রাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কঠিন ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 83-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে সেখানে তাদের পরিবার, বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় মদিনায় জীবন

মাইগ্রেশনের পর ১ ম বছর

একটি সুন্দর উত্তরাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল মহান আল্লাহর ঘর, মসজিদে নববী নির্মাণ। জমিটি দুই এতিম বালক সুহাইল ও সাহল (রাঃ)-এর ছিল, যারা বিনা মূল্যে জমিটি প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 165-166-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায়

না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা

সকল সাহাবীর মত আলী ইবনে আবু তালিবও পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং এর অধিকার আদায়ে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও বাস্তব প্রয়োগের প্রতিফলন ঘটেছে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার বলেছিলেন যে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে, মৃত্যুবরণ করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা মহান আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। অন্য একটি অনুষ্ঠানে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কিতাবে, যারা আগে বেঁচে ছিলেন তাদের উপকারী গল্প, পরে কী ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বাণী এবং মানুষের মধ্যে বিষয়গুলির উপর রায়। পবিত্র কুরআন গুরুতর এবং ঠাট্টা করার মত কিছু নয়। অত্যাচারীদের মধ্যে যে কেউ তা অবহেলা করবে, মহান আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি অন্য কিছুতে হেদায়েত অন্বেষণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেবেন। এটি শক্তিশালী রশি, প্রজ্ঞাময় উপদেশ এবং সরল পথ। এটি এমন একটি কিতাব যা ইচ্ছা ও কামনা বিকৃত করতে পারে না এবং জিহ্বা ভুল উচ্চারণ করতে পারে না। এর বিস্ময় কখনও শেষ হয় না এবং পণ্ডিতরা কখনও ক্লান্ত হন না। যে এটি উদ্‌ধৃত করবে, সত্য কথা বলবে, যে এর উপর আমল করবে সে পুরস্কৃত হবে। যে সে অনুযায়ী বিচার করবে, সে ন্যায়পরায়ণ হবে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে এর দিকে ডাকবে, সে সরল পথের দিকে পরিচালিত হবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি কিন্তু তিনি জানতেন কেন এটি অবতীর্ণ হয়েছে, কখন এটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং কার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে গভীর বোধগম্যতা এবং বাকপটু, সত্যবাদী ভাষা দিয়েছিলেন।

তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআনও মুখস্ত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 91-92-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের হক আদায় করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

প্রাসঙ্গিক সমস্যা সম্বোধন

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহের অধিকারী ছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করতেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 105 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের সর্বদা এমন বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত যা স্পষ্ট করা হলে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তাঁর উপর বর্ষিত হও এবং সেই বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ কর যেগুলি সম্পর্কে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, যেমন মানুষের অধিকার পূরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, পক্ষের বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা মুসলমানদেরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা থেকে বিভ্রান্ত করেছে এবং সময়ের সাথে সাথে মুসলিম জাতির সাধারণ শক্তি হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ এটি।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মানুষকে ইসলামের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সতর্ক করেছিলেন যা সহজেই বোধগম্য ছিল কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে জটিল বিষয়গুলি মানুষের হৃদয়ে সন্দেহ তৈরি করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 121-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের, বিশেষ করে প্রচারকদের অবশ্যই সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মেনে চলতে হবে এবং যারা যোগ্য তাদের কাছেই জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলতে হবে। এই দিনে এবং যুগে, যখন অনেক মুসলমান ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কোন মানে হয় না।

জ্ঞান অন্বেষণ

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহের অধিকারী ছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করতেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 105 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, তিনি অল্প বয়স থেকেই পড়তে এবং লিখতে পারতেন এমন কয়েকজনের একজন। এটি আবার তার জ্ঞানের তৃষ্ণাকে তুলে ধরে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 113-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি যতক্ষণ না শিখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঘুমাবেন না, যা মহান আল্লাহ সেদিন নাজিল করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 343-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা

এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

শ্রেষ্ঠ সঙ্গী

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য পরবর্তী জীবন জুড়ে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 113-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের

জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সাহায্যকারী এবং অভিবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (রহঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সহযাত্রী হিজরতকারী, মুহাজিরগণ এবং সাহায্যকারী, আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে ভাই ভাই হওয়ার উপদেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে একসময় তাদের দৃঢ় সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মাইগ্রেশনের পর 2 য় বছর

বদরের যুদ্ধ

নম্রতার মধ্যেই মহানতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের উটে চড়ে পালা করে নিলেন কারণ তাদের কাছে খুব কম ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী এবং আবু লুবাবার সাথে একটি উট ভাগ করে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দুই সাহাবীকে হাঁটতে হাঁটতে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন তিনি উটে চড়ে যাওয়ার জন্য তাঁর স্থান নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা তার চেয়ে শক্তিশালী নয় যার অর্থ, তিনি আহত বা অসুস্থ ছিলেন না যে তিনি হাঁটতে না পারার অজুহাত হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন এবং তিনি আরও বলেন যে তিনি হাঁটার প্রতিদান চান। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 258-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের নেতাদের বিপরীতে যারা একই সমস্যার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করে তাদের অনুসারীরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রহণ করে, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মুখোমুখি হওয়া অসুবিধার মধ্যে অংশীদার হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ছিল তার মহান বিনয়ের পরিচায়ক। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী,

2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63, দেখায় যে নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজনের চলার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডুয়েল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনজন অমুসলিম তিনজন মুসলমানকে একক লড়াইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দ্বন্দ্বে অংশ নেন এবং প্রতিপক্ষকে হত্যা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 144-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত

তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

একটি করুণাময় আইন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয় লাভের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনেক অপরাধ ও যুদ্ধের জন্য তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরামর্শ অপছন্দ করেন। তারপর আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের মৃত্যুদন্ড থেকে ক্ষমা করার পরামর্শ দেন এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্রয় করার অনুমতি দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উপদেশে সন্তুষ্ট হন এবং এর উপর আমল করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 305-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের

কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

একটি সুখী বিবাহ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, ফাতিমা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, এবং এটি গৃহীত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 145-146-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন পিতা তার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য কেবল সর্বোত্তম পুরুষেরই ইচ্ছা পোষণ করেন, তাই, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কন্যাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ দিয়েছেন, এটি তাঁর মহান গুণের ইঙ্গিত দেয়। একজনকে অবশ্যই এই উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিতে হবে যদি তারা একটি সফল বিবাহ করতে চায়।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন একজনকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি দেখা উচিত তা হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন তারা তাদের পত্নীর পাওনা কি অধিকার, তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। জ্ঞান একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

একটি সরল জীবন

আলী ইবনে আবু তালিব, এবং তার স্ত্রী ফাতিমা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মতো একটি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেছিলেন। তারা পার্থিব বিলাসিতা ভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি এবং অন্যদের সাহায্য করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার বলেছিলেন যে তার বাড়িতে একটি মেষের চামড়া ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র ছিল না যার উপর তারা ঘুমাতো।

তারা দুজনেই জীবিকার জন্য কাজ করেছেন এবং জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সংগ্রাম করেছেন। একবার, যখন কিছু যুদ্ধবন্দীকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হল, তখন তারা তাঁকে তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য একজন চাকর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের বিক্রি করে মদিনার গরীবদের জন্য মূল্য ব্যয় করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের পরিবারের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। পরে সেই রাতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাদের উভয়কে ঘুমানোর আগে পড়তে একটি আধ্যাত্মিক ব্যায়াম শিখিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে এটি একজন চাকর পাওয়ার চেয়ে উত্তম। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 147-149-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

উপার্জনের গুরুত্ব

একবার আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত থাকায় কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। তিনি একজন বেদুইন মহিলাকে খুঁজে পেলেন এবং তাকে এক খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের স্তূপ ধুয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তিনি কাজ করেছিলেন যতক্ষণ না তার হাত ফোঁড়া হয়ে যায় এবং যখন তিনি তার মজুরি চাইলে তাকে ষোলটি খেজুর দেওয়া হয়। তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে আসেন এবং কিছু কিছু তাঁর সাথে শেয়ার করেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১৪৭ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর

আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্‌ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

পাঠদানে আন্তরিকতা

এক সময়ে, রাত্রিকালে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব এবং ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারা আশা করেছিলেন যে তারা জেগে থাকবেন এবং স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়বেন। . তিনি তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাদের জাগিয়ে দিলেন এবং তারপর প্রশ্ন করলেন কেন তারা নামাজ পড়ছে না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেছিলেন যে তাদের আত্মা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন এবং নিজের কাছে 18ম অধ্যায় আল কাহফ, আয়াত 54 পাঠ করলেন:

"... কিন্তু মানুষ কখনোই, যে কোনো কিছুতেই, [প্রবণ] বিবাদের শিকার হয়েছে।"

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৯৫৫ নং হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আলী এবং ফাতিমা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, নিয়মিত স্বেচ্ছায় রাতের নামায আদায় করতেন, এই উপলক্ষে তারা তা করেননি যতক্ষণ না তাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা তা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

উপরন্তু, এই ঘটনাটি দেখায় যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিকতা ছিল, যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষার জন্য ছিলেন, কারণ তিনি এই ঘটনাটি মানুষের কাছ থেকে গোপন করেননি, যদিও একজন মূর্খ ব্যক্তি। তার সমালোচনা করতে এটি ব্যবহার করতে পারে।

পরিশেষে, এই ঘটনাটি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে

দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

মাইগ্রেশনের পর ৩ য় বছর

উহুদের যুদ্ধ

মিশন অব্যাহত

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা বেড়ে যায় যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে বলে দাবি করা শোনা যায়। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাদের শক্তি এবং অনুপ্রেরণার কারণে শহিদ হয়েছিলেন বলে আশা হারান। কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ) ছাড়া বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, তাই তিনি তাঁর তরবারির খাপ ভেঙে ফেলেন এবং পবিত্র মূর্তি না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। নবী মুহাম্মদ সা. তারা পশ্চাদপসরণ না করা পর্যন্ত তিনি তাকে রক্ষা করতে থাকেন। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 29-31 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 163-164 এ আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীরিকভাবে আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই, ইসলামের প্রকৃত দূত হয়ে তিনি যে জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তার জন্য তাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার উপর কাজ করেছিল তখন বহির্বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল। এর ফলে অগণিত মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, আজকে অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দেখানো শুধুমাত্র একজনের চেহারা, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। পবিত্র কুরআনে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করা এবং তাঁর ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অংশ। শুধুমাত্র এই মনোভাব নিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ইসলামিক চেহারা গ্রহণ করা শুধুমাত্র বহির্বিশ্বকে ইসলামকে অসম্মান করার কারণ করে। তাদের এই অসম্মানের জন্য দায়ী করা হবে কারণ তারা এর কারণ। তাই একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

উপরন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে যে তারা বিচারের দিনে এই ভূমিকা পালন করেছে কি না। একজন বাদশাহ যেভাবে তাদের কূটনীতিক ও প্রতিনিধির উপর ক্রুদ্ধ হবেন যদি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহান আল্লাহও সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

অসুবিধার মধ্যে বাধ্যতা

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা অবগত হন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন যাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইসলাম ভালোর জন্য। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের বেদনাদায়ক ক্ষত এবং ক্লান্ত শরীর সত্ত্বেও, অমুসলিমদের অনুসরণে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। আলী ইবনে আবু তালিব সহ সাহাবীগণ যখন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখন মহান আল্লাহ ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, আলে ইমরান, ১৭২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন:

“যারা [মুমিনদের] আঘাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সাড়া দিয়েছিল তারা আঘাত করেছিল। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 67-68-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন

তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

মাইগ্রেশনের পর ৪ র্থ বছর

বনু নাদির

প্রতিশোধ ভুলে যাওয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর চতুর্থ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি অমুসলিম গোত্র বনু নাদিরকে পরিদর্শন করেন, যার কাছে তিনি পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। সহায়তা এবং শান্তির সাথে, আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য। তারা উত্তর দিয়েছিল যে গোপনে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করার সময় তারা তাকে সাহায্য করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন এবং তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি চলে যান এবং মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তারপর বনু নাদিরদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে এবং সুরক্ষা দেয়। মুনাফিকরা বনু নাদিরকে থাকার জন্য অনুরোধ করল এবং তাদের সমর্থন দিল। তারা দাবি করেছিল যে, যদি বনু নাদিররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তবে তারা তাদের সমর্থন করবে, যদি বনু নাদির যুদ্ধ করে তবে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যদি তাদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয় তবে তারা তাদের সাথে চলে যাবে। তাদের এটি বনু নাদিরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা কিছুই করেনি যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ

তাদের উপর সন্তুষ্ট, বনু নাদিরকে অবরোধ করেন, তখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা তাদের রক্তকে বাঁচিয়ে দিন এবং পরিবর্তে তাদের নিরাপদ পথ প্রদান করুন যাতে তারা তাদের জিনিসপত্র সহ এলাকাটি খালি করতে পারে। . বনু নাদিরদের বিরুদ্ধে তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত যা কিছু বহন করতে পারে তা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 100-101-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বদর

উহুদের যুদ্ধ ছেড়ে যাওয়ার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরে আবার মিলিত হওয়ার জন্য দুই সেনাবাহিনীর জন্য নিয়োগের ঘোষণা দেন। সময় এলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় 1500 সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং অমুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করে বদরে শিবির স্থাপন করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় 2000 সৈন্য ছিল কিন্তু বদর থেকে দূরে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন এবং যদিও তিনি নিজেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হতে তারা ভীত হয়ে পড়ায় তারা তার কোন বিরোধিতা না করে মক্কায় ফিরে আসেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বদরে থেকে যান এবং কিছু লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। আট দিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বদর ত্যাগ করেন যা আরব জনগণের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা 306-307-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের দৃঢ়তার কারণে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয় দান করেছিলেন যা সামরিক বিজয়ের চেয়ে সারা আরব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান

এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয় । পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ

মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

মাইগ্রেশনের পর ৫ ম বছর

আহযাবের যুদ্ধ

অবিচল আনুগত্য

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান (রা.)-এর পরামর্শে তিনি মদিনার চারপাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ

তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। মদিনার বাইরে ও ভিতরে শত্রুরা থাকায় উদ্বেগ ও ভয় বেড়ে গেল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পশ্চাদপসরণ এবং তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে একটি উপজাতিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে অমুসলিম সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ইচ্ছাটি কি মহান আল্লাহর নির্দেশ, নাকি তাঁর নিজের পছন্দ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি তার নিজের পছন্দ ছিল কারণ তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন যে কীভাবে আরবের বিভিন্ন গোত্র মদিনায় নেমে এসেছে এবং তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তিনি যেভাবে পারেন। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উত্তর দিলেন যে, ইসলামের আগে অমুসলিম সেনাবাহিনী কখনই মদিনায় আক্রমণ করার সাহস করত না এবং এখন যেহেতু মহান আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা সম্মানিত করেছেন। , তারা কখনোই সত্যের সাথে আপস করবে না যদিও এটি যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 142-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই যুদ্ধের সময় কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কারণ কিছু অমুসলিম পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। আমর ইবনে আব্দুল ওদ ছিলেন একজন সুপরিচিত অমুসলিম যোদ্ধা যিনি পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একটি দ্বৈরথের জন্য একটি উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সাড়া দেন এবং প্রথমে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আমর প্রত্যাখ্যান করলে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 170-171-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯

নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল

আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

একটি প্রস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দক/আহজাবের যুদ্ধ শুরু হয়। যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তিনি শত্রুদের মদিনার একমাত্র পাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। থেকে সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। মদিনার বাইরে ও ভিতরে শত্রুরা থাকায় উদ্বেগ ও ভয় বেড়ে গেল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ এই যুদ্ধ জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করলেন। অমুসলিম বাহিনী যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে

নিমজ্জিত করে। আবহাওয়া তাদের বিপক্ষে থাকায় অমুসলিমরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা সফলভাবে পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 154-155-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম সৈন্যবাহিনী চলে যাবার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু শিবির থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তাকে এমন কিছু না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আমার মুখোমুখি। শত্রু শিবিরে পৌঁছে তিনি অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করলেন। হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ধনুক বোঝাই করে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে দেওয়া আদেশের কথা মনে পড়লে তিনি তাঁর হাত আটকে রাখেন। তিনি গোপনে অমুসলিমদের একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের সরবরাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল, মহান আল্লাহ প্রেরিত বাতাস তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তারা মুসলমানদের খনন করা পরিখা ভেদ করতে পারেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী'র দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবী (সাঃ) এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1383-1384-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলমানের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর

পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের দিকনির্দেশনাকে বিশ্বাস করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ঘটবে তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা উত্তম যা কেবলমাত্র আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন একজন ব্যক্তি কিছু পাওয়ার পরে অনুশোচনা করতে চেয়েছিলেন। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদি তারা কঠিন থেকে মুক্তি পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

বনু কুরাইজা

পরিণতির সম্মুখীন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনা থেকে ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান (রা.)-এর পরামর্শে তিনি মদিনার চারপাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। অবশেষে, মহান আল্লাহ, অমুসলিম সেনাবাহিনীর দিকে একটি প্রচণ্ড বাতাস প্রেরণ করেন যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে

ডুবিয়ে দেয়। আবহাওয়া তাদের বিপক্ষে থাকায় অমুসলিমরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা সফলভাবে পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। পরদিন সকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগণের সাথে পরিখা ত্যাগ করেন এবং তাদের অস্ত্র রেখে বাড়ি ফিরে আসেন। যুদ্ধের অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন, মহান আল্লাহ তাঁকে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহও 33 অধ্যায়, 25-27 আয়াত নাজিল করেছেন:

"এবং আল্লাহ কাফেরদের প্রতিহত করলেন, তাদের ক্রোধে, কোন কল্যাণ না পেয়ে... এবং তিনি আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সমর্থন করেছিল তাদের তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন [যাতে] একটি দলকে তোমরা হত্যা করেছিলে, এবং তোমরা একটি দলকে বন্দী করেছ... আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 158-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অভিযানে আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রগামী মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা বহন করেন। যখন তিনি তাদের দুর্গে পৌঁছান তখন তিনি ডেকে বললেন যে তিনি হয় শহীদ হবেন অথবা তিনি তাদের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলবেন। বনু কুরায়জা যখন সাহাবীদের সাহসিকতা দেখে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তখন তারা সাদ বিন মুআয্‌দ (রা.)-এর রায় মেনে নিতে রাজি হন, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগে খুব

ভালোভাবে জানত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 172-173-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যত শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাদের সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন জেল এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে । এটা শুধু নেতা নয় সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলমানকে কখনই অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা এখনও তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলমানের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

বিশ্বাসঘাতকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং এর পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজা একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয়েছিল, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভাল করে চিনতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের রায়ের জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 166-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি খুব সাধারণ রায়, এমনকি এই দিন এবং যুগেও। উপরন্তু, তাদের অপরাধ ছিল একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, পুরো জনপদে ভরা। তাদের পরিবর্তে নির্বাসিত হলে তারা আবার মদিনার সাথে যুদ্ধ করত।

যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

মাইগ্রেশনের পর ৬ষ্ঠ বছর

আগুনের দুটি জিহ্বা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরা এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একটি দল তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের আশেপাশের এলাকা ঠাসাঠাসি হওয়ায় দুইজন সাহাবী, একজন মদীনার এবং অন্যজন মক্কার, তাদের সাথে সামান্য ঝগড়া হয়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই সুযোগটি নিয়ে আরও বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই দাবি করে যে, মক্কার হিজরতকারীরা তাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে। মক্কার হিজরতকারীদের মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক শিশু তার মন্দ কথা শুনে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বড় শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও এই শব্দগুলি বলেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন পদক্ষেপ নেননি। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 7-8 অবতীর্ণ করেছেন:

"তারা তারা যারা বলে, "যারা আল্লাহর রসূলের সাথে আছে তাদের উপর ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আমানত

আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, "যদি আমরা আল-মদীনায় ফিরে আসি, [ক্ষমতার জন্য] যত বেশি সম্মানিত হবে, তত বেশি বিনয়ীকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে।" আর সম্মান আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।"

এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর কান ধরে সান্ত্বনা দিয়ে মন্তব্য করলেন যে, তিনিই তাঁর কান মহান আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। . ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 213-215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: "আমরা ঈমান এনেছি" কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ

শেয়ারিং সমস্যা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক। তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন সাহাবী তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত শিবিরের স্থানেই ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত

হয়ে পড়ে। মদিনায় অপবাদের প্রভাব যখন তীব্র হয় তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সাহাবী আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে আনলেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা উভয়েই আয়েশা সম্পর্কে ভাল কথা বলেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং এমনকি একজন সাক্ষী, একজন দাসীকে ডেকে তার উত্তম চরিত্রের আরও প্রমাণ খুঁজে পান, যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে কাজ করতেন। . তিনি আয়েশা (রা) সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই বলেননি, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 219-220-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ এড়াতে চেষ্টা করা উচিত, যেমন তাদের সমস্যাগুলি অনেক লোকের সাথে শেয়ার করা। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে যখন কেউ অনেক লোককে বলে তখন তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং পরামর্শ চাওয়া তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে যা তাদের অধৈর্যতার স্পষ্ট লক্ষণ। উপরন্তু, এই মনোভাব শুধুমাত্র একজনকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে কারণ তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তা বৈচিত্র্যময় হবে যার কারণে তারা সঠিক পথ সম্পর্কে আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ, কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করলেই তার নিশ্চিততা বৃদ্ধি পাবে। অনেক লোকের কাছে বারবার একজনের সমস্যা পুনরাবৃত্তি করাও তাদের সমস্যার উপর খুব বেশি ফোকাস করার কারণ হয় যা এটিকে সত্যিকারের চেয়ে বড় এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, এমনকি এটি তাদের অন্যান্য দায়িত্ব অবহেলা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা কেবলমাত্র এই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। আরো অধৈর্যতা।

তাই মুসলমানদের তাদের অসুবিধার বিষয়ে শুধুমাত্র কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। যেমন একজন ব্যক্তি তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকামী হবে একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের সমস্যাগুলি তাদের সাথে শেয়ার করা যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে যুক্ত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সমস্যা তাদের সাথে শেয়ার করা যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

লেটিং থিংস গো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক। তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন সাহাবী তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত শিবিরের স্থানেই ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরে, মহান, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁর পিতা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই অপবাদ ছড়ানোয় অংশ নেওয়া তাঁর আত্মীয়কে আর আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ, তারপর অধ্যায় 24 আন নুর, 22 নং আয়াত

নাজিল করেছেন, তাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে অন্যের ভুল ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে উত্সাহিত করেছেন:

" আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও সম্পদশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের [সাহায্য] না করার শপথ না করে এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোষণা প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করতে থাকেন। জামে আত তিরমিযী, 3180 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত

করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তখন দলটিকে মক্কায় একটি বিকল্প রাস্তা নিতে নির্দেশ দেন যা ছিল রুক্ষ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। অবশেষে, যখন তারা হুদাইবিয়ার নিকটে পৌঁছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উটটি বসল এবং আর যেতে অস্বীকার করল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এই এলাকার মধ্যে থাকাই তাদের জন্য সর্বোত্তম। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা সেদিন তাঁর কাছ থেকে যা অনুরোধ করবেন তা তিনি গ্রহণ করবেন যতক্ষণ না তা মহান আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী না হয়। . এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 224-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 2731-2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিম নেতাদের তাদের খারাপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে, মহান আল্লাহ তায়ালার সামনে এমন একজনকে প্রেরণ করেছেন যে তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে। ইসলামের সমর্থনে এবং যার হৃদয়কে মহান আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কার কথা বলছেন, তখন তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে ইঙ্গিত করলেন, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 173-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ

কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রিদওয়ানের অঙ্গীকার

দাসত্বের অঙ্গীকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে তাঁর শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বার্তাটি দেওয়ার পর তাকে মক্কার অমুসলিমরা আটক করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না, কারণ তিনি কেবল নিরস্ত্র অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করেননি বরং মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবেও প্রবেশ করেছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাষ্ট্রদূতদের সবসময় সম্মানের সাথে আচরণ করা হয় এবং তাদের ক্ষতি করা যুদ্ধ ঘোষণা। এই

দিন এবং যুগেও এটি সত্য । অঙ্গীকারের সময় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত অন্য হাতে রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর হাতটি উসমান (রা.)-এর হাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার। মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বিষয়ে, মহান আল্লাহ অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন, যেমন অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 10:

"নিশ্চয়ই, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, তারা আসলে আল্লাহর কাছে আনুগত্য করছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত। সুতরাং যে তার কথা ভঙ্গ করে সে কেবল নিজেরই ক্ষতির জন্য তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

এবং অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 18:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়ের পুরস্কৃত করেছেন।"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 227-228 এবং সহীহ বুখারি, 4066 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তা পূরণ করা মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা পবিত্র কুরআনের 7 অধ্যায় আল আরাফের 172 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। .

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু

কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদেরকে দেখায় যে যদিও আল্লাহ, মহান, প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনি অসীম দয়ালুও।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত বিষয়ে খোলা মন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় জাগতিক বিষয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস না করা অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

পরিশেষে, এই চুক্তিটি যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সময় এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সত্যিকারের ভালবাসা এবং আন্তরিকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অ-মুসলিমদের পক্ষে ছিল বলে মনে হয়। মক্কার মুসলমান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট, চুক্তির অংশ ছিল (ওমরা) না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। দশ বছরের শান্তির এই চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে যখনই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মিলিত হতো তখন প্রায়ই কোনো না কোনো যুদ্ধ হতো কিন্তু চুক্তির কারণে যুদ্ধ শেষ হলে যখনই এই লোকেরা মিলিত হতো তারা কেবল কথা বলতো। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আগমনের পরের আগের বছরগুলোর তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে অনেক বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। এই সুস্পষ্ট বিজয় মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অধ্যায় 48 আল-ফাত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 231-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু শান্তি চুক্তি লিখেছিলেন। অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপাধি লিখতে আপত্তি জানায়, অর্থাত্ আল্লাহর রাসূল, মহান, শান্তি ও বরকত, এবং তারা জোর দিয়েছিল যে তারা কেবল তাঁর নাম লিখবে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, তাঁর উপাধিটি দলিল থেকে মুছে ফেলতে এবং শুধুমাত্র তাঁর নাম লিখতে কিন্তু আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কারণে তিনি তা করতে পারেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর নিজ হাতে তাঁর পদবী মুছে দেন যাতে চুক্তিটি করা হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 173-174-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই আলী (রা) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

মন্দ চক্রান্ত ব্যর্থ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে সন্ধি করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন, যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অনুগ্রহ করে বলে মনে হয়। মক্কার অমুসলিমরা। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। এটা স্পষ্ট ছিল যে মক্কার অমুসলিমরা শুধুমাত্র এই দাবি করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের ঐক্য ভেঙে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনা থেকে আবু বাসির (রাঃ) কে উদ্ধার করার জন্য দু'জন লোককে পাঠিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য এক

নির্জন এলাকায় পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর, যখনই কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কায় তাদের কারাগার থেকে পালিয়ে যান, তখনই তারা আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যোগ দেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের বণিক কাফেলাকে লুটপাট করতে শুরু করে, কারণ শান্তি চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র মদিনার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে মক্কাবাসীদের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। তারা অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, তাঁর কাছে আবূ বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর বাহিনীকে মদিনায় ডাকার জন্য অনুরোধ করেন যাতে অভিযান ও লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হন এবং এই ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর প্রতি ভালবাসা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর থেকে এবং তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। জামে আত তিরমিযী, ৩৭১৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে আলী (রাঃ)-কে কেউ ভালোবাসে না, একজন মুমিন ব্যতীত এবং একজন মুনাফিক ছাড়া কেউ তাকে ঘৃণা করে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৭৩৬ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে

ভালবাসেন তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে শুয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পেয়েছিলেন যখন তার পিঠ ধুলোয় আবৃত ছিল এবং তার পিঠ থেকে ধুলো অপসারণ করার সময় তিনি তাকে ধূলির পিতা বলেছেন। এই ঘটনার কারণে এই ডাকনামটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হয়ে ওঠে, এবং লোকেরা যখন তাকে এটি দিয়ে উল্লেখ করে তখন তিনি খুশি হন। এটি সহীহ বুখারী, 6204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার কারণেই তিনি তাঁকে যে ডাকনাম দিয়েছিলেন তা তিনি পছন্দ করতেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার

সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

সমবেদনা

মুসলমানদের প্রতি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর যে করুণা ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলোচনা করেন। অধ্যায় 58 মুজাদিলা, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে পরামর্শ করতে চাও, তখন পরামর্শের আগে একটি দাতব্য দাতব্য উপস্থাপন কর..."

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, লোকদেরকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতে বলুন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি বার্লি দানার সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার পরামর্শ দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকে তা বহন করতে পারবে না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি মানুষের জন্য সহজ করার জন্য অবতীর্ণ হয়। অধ্যায় 58 মুজাদিলা, আয়াত 13:

“আপনি কি আপনার পরামর্শ দাতব্য সংস্থার সামনে উপস্থাপন করতে ভয় পেয়েছেন? অতঃপর যখন আপনি তা করবেন না এবং আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন [অন্তত] সালাত কায়েম করুন এবং যাকাত প্রদান করুন

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 95-96-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

ঐশ্বরিক ভালোবাসা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকেও আলীকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৪৯ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ঐশ্বরিক ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বান্দাকে ভালবাসেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তাকওয়া। এর অর্থ হল তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে এবং তারা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়া। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয় কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দেয়। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাদের জন্য তাদের রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রচেষ্টার উপর মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বেনামী। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি অর্জনের জন্য জাগতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। যেহেতু এটি প্রদর্শনের মতো অনেক পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র একজনের পুরস্কারকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা বিখ্যাত হয়ে যায় তবে তাদের উচিত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন না করে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

মাস্টার, অভিভাবক এবং বন্ধু

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি যার মালিক, রক্ষক এবং বন্ধু ছিলেন, তারপর আলী ইবনে আবু তালিবও তাদের মালিক, অভিভাবক এবং বন্ধু। জামে আত তিরমিযী, ৩৭১৩ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি, অনেক কিছুর মধ্যে, সঠিক রোল মডেল বেছে নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তবুও তাঁর অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে এই সমালোচনার ভিত্তি। মিথ্যা ছাড়া কিছুই না। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই একজনের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনেই প্রকৃত সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তার ব্যতীত অন্য কোন পথ বেছে নেয় তবে তারা যা কিছু কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

মাইগ্রেশনের পর ৭ ম বছর

খায়বারের যুদ্ধ

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালবাসা অর্জন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের দুর্গে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করলেন যে পরের দিন তিনি তার ব্যানারটি এমন একজনকে দিতে যাচ্ছেন যিনি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন এবং এই লোকটিও আল্লাহর প্রিয়। মহান, এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে এই ব্যক্তি খায়বার জয় করবে। পরের দিন তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান এবং তাকে পতাকার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং খায়বার বিজয় হয়। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 251-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং অন্যান্য সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করে, যাতে করে। তারাও মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে একজন মুসলমান কেবল তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয়

তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয় তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হবে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দেন যাতে তারা সেগুলিকে তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলমান কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য

কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ এবং উভয় জগতের সফলতার একমাত্র পথ।

অন্যদের গাইডিং

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের দুর্গে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করলেন যে পরের দিন তিনি তার ব্যানারটি এমন একজনকে দিতে যাচ্ছেন যিনি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন এবং এই লোকটিও আল্লাহর প্রিয়। মহান, এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে এই ব্যক্তি খায়বার জয় করবে। পরের দিন তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে ব্যানারটি অর্পণ করলেন। তাকে তাদের দুর্গের কাছাকাছি যেতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার আগে তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতঃপর উপদেশ দিলেন যে, যদি একজন ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে পথনির্দেশ গ্রহণ করে তবে তা হবে আরবদের কাছে পরিচিত সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান উটের পালের চেয়েও উত্তম। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 251-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে।

আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

সফর (ওমরা)

দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে, তিনি সফর (ওমরা) পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন, যেমনটি আগের বছর মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে একমত হয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এই খবর প্রচার করছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত কষ্ট ও কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মহান আল্লাহর ঘর, কাবাঘরের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর যারা সেদিন শক্তি প্রদর্শন করেছিল তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, তারা আংশিকভাবে আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 308-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি কোন ঘাটতি অর্থ, দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা অবলম্বন করে তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং

আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের কাছে পেশ করা হয় তখন তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে দেখে না যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে কোন পার্থিব জিনিস রয়েছে বা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের অজানা। অর্থাৎ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই বাস্তবতা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখতে হবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলমান সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে ভয় পায় না বা তাদের নম্রতা তাদের অপমানিত এবং অসম্মানিত বলে মনে করে না।

মাইগ্রেশনের ৪ ম বছর

মক্কা বিজয়

প্রথমে ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে অন্য একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল এমন একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ অবগত হওয়ার পর যে এই খবর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছে, তখন তারা তাদের একজন নেতা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তারা চুক্তিটি পুনঃনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি নিয়ে চিন্তিত। আবু সুফিয়ান আলী ইবনে আবু তালিব সহ অনেক প্রবীণ সাহাবীর সাথে কথা বলেছিল, তাদের উপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে সুপারিশ করার জন্য তাদের অনুরোধ করেছিলেন। তিনি উপজাতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে জয় করার জন্য তাদের সাথে তার বিভিন্ন অনুষঙ্গ তালিকাভুক্ত করেছিলেন কিন্তু তারা সবাই একইভাবে উত্তর দিয়েছিল। তারা তাকে খুশি করার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে অস্বীকার করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ করতে বা এটি পুনর্নবীকরণ করতে রাজি হতে চায়নি। তারা পরিবর্তে সিদ্ধান্ত তাদের নেতার উপর ছেড়ে দিয়েছিল যে তার ঐশ্বরিক নির্দেশিত পছন্দের

উপর আস্থা রেখেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 381-382-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি

কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

করুণার সাথে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল যারা পবিত্রতার সাথে মিত্র ছিল। নবী মুহাম্মদ সা. যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাতিব ইবনে আবু বালতা রাদিয়াল্লাহু আনহু, একজন মহিলা বার্তাবাহককে মক্কায় একটি চিঠি দিয়ে অমুসলিমদের জানিয়েছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় যাচ্ছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই চিঠির বিষয়ে ঐশ্বরিকভাবে অবহিত করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ আলী ইবনে আবু তালিব, মিকদাদ বিন আমর এবং জুবায়ের বিন আওয়ামকে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা তাকে বাধা দেয় এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে। মক্কায় পৌঁছানোর আগেই চিঠি। পরিকল্পনাটি সফল হয়েছিল এবং চিঠিটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যিনি তখন হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হাতিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ধর্মত্যাগ করেননি বা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস পছন্দ করেননি তবে তিনি কেবল চিঠিটি লিখেছিলেন কারণ মক্কায় তাঁর এমন কেউ নেই যে সেখানে তাঁর পরিবার এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে এবং বিশ্বাস করেছিল যে চিঠির মাধ্যমে তিনি লাভ করবেন। তাদের অনুগ্রহ এবং ফলস্বরূপ তারা তার পরিবার ও সম্পত্তির ক্ষতি করবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত করেছেন যে তিনি সত্য বলেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব, হাতিবকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, আল্লাহ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি বদর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ করেছেন। বদর যুদ্ধের সকল অংশগ্রহণকারীকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর

জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 379 এবং সহীহ বুখারি, নম্বর 3007-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ 60 মুমতাহানা, আয়াত 1 নাজিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর, অথচ তারা অবিশ্বাস করেছে যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, নবীকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে বহিষ্কার করেছে [কেবল] কারণ তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। , তোমার প্রভু। আপনি যদি আমার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ/প্রয়াস এবং আমার অনুমোদনের উপায় খোঁজার জন্য বেরিয়ে আসেন, [তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন না]। আপনি তাদের প্রতি স্নেহ [অর্থাৎ, নির্দেশ] প্রকাশ করেন, কিন্তু আপনি যা গোপন করেছেন এবং যা প্রকাশ করেছেন তা আমি সবচেয়ে বেশি জানি। আর তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী'স, দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবী (সাঃ) এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1684-1685-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও হাতিবের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মন্দ ছিল না, কারণ তিনি তাঁর পরিবার এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে জানতেন যে অমুসলিমদের কাছে তাঁর চিঠি মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনায় কোনও পার্থক্য করবে না, যেহেতু মক্কার অমুসলিমরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল, তাই তার উচিত ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক থাকা এবং নিজের পরিবার ও সম্পদ মহান আল্লাহর কাছে অর্পণ করা।

এই একক ভুলের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমগ্র জীবন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে গেছেন এবং তাই এই একটি ভুলকে উপেক্ষা করেছেন।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা

যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইসলাম হল ভদ্রতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল যারা পবিত্রতার সাথে মিত্র ছিল। নবী মুহাম্মদ সা. যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অমুসলিমদের কাছ থেকে নেওয়ার পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন, মহান আল্লাহর ঘর কাবার চাবি নিয়ে। পূর্বে চাবির দায়িত্বে ছিলেন উসমান বিন তালহা। আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে চাবিগুলো নিজের কাছে রাখার অনুরোধ করেন যাতে তিনি কাবার রক্ষক হতে পারেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উসমান বিন তালহাকে তলব করেন এবং তার কাছে চাবি ফিরিয়ে দেন এবং তাকে বলেন যে এই দিনটি তাকওয়া ও ধার্মিকতার দিন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 408-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুজুল, 4:58, পৃষ্ঠা 54 অনুসারে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমানকে চাবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ মহান আল্লাহ, অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 58 নাজিল করেছেন:

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ আপনাকে আমানত তাদের হকদারদের কাছে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন; আর যখন তুমি মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কতই না মহৎ আদেশ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

এর জবাবে উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি

কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুনকে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে এবং মক্কা বিজয়ের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বনু জুদাইমাহ গোত্রের কাছে তাদের ডাকার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ইসলামের কাছে। যদিও তারা আগেই ইসলাম কবুল করেছিল, ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাদের কিছু গোত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোত্রের ভুলের ক্ষতিপূরণের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেন এবং সম্পদের ক্ষতির জন্য এমনকি একটি কুকুরের পানির পাত্রের জন্যও ক্ষতিপূরণ দিতেন। এমনকি যদি তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে ত্রুটি থাকে তবে তিনি তার কাছে থাকা অবশিষ্ট সম্পদ তাদের দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কর্মের অনুমোদন দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 190-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে

দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

হুনাইনের যুদ্ধ

আনুগত্যে বিজয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ছিলেন তাদের মধ্যে একজন যারা তাঁর মাটিতে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদেরকে ডেকে আনার পর তারা সবাই এগিয়ে যেতে থাকে যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 451-এ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 191-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রাথমিক অসুবিধাটি ঘটেছিল যখন কিছু অল্পবয়সী সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যুদ্ধের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের বিশাল বাহিনী পরাজিত হবে না। তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 25-26:

"আল্লাহ আপনাকে অনেক অঞ্চলে এবং [এমনকি] হুনাইনের দিনে বিজয় দান করেছেন, যখন আপনার বিপুল সংখ্যা আপনাকে সন্তুষ্ট করেছিল, কিন্তু তা আপনার কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী আপনার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল [অর্থাৎ, সত্ত্বেও]] এর বিশালতা; অতঃপর তুমি পলায়ন করে ফিরে গেলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং সৈন্য প্রেরণ করেন [অর্থাৎ ফেরেশতা] যাদেরকে আপনি দেখতে পাননি এবং কাফেরদের শাস্তি দেন। আর এটাই কাফেরদের প্রতিদান।"

এই ঘটনাটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রকৃত সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা, পবিত্র ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। নবী মুহাম্মদ সা. সত্যিকারের সাফল্য পার্থিব সম্পদ, বড় সংখ্যা বা শারীরিক শক্তির সাথে যুক্ত নয়।

যদিও পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগুলি কালের সূচনাকাল থেকে বিশেষ করে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে বিশ্বাসীদের প্রভাবিত করেছে, তবুও মনে হচ্ছে আধুনিক দিনের পরীক্ষাগুলি মুসলমানদের জন্য আরও অসুবিধা এবং অপমানের দিকে নিয়ে যায়। যদিও ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল তা কেবল উভয় জগতে তাদের সম্মানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফল এবং ফলাফলের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হল যে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা যখন প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন আধুনিক দিনের মুসলমানদের চেয়েও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যা সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তারা তাদের মুখোমুখি হয়েছিল। পরীক্ষা এবং অসুবিধা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার

সময়, মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। এর ফলে তারা নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর কাছ থেকে মহান সম্মান ও আশীর্বাদ লাভ করে। অথচ এই দিন ও যুগে অনেক মুসলমান পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে না। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে পরীক্ষার মাধ্যমে সাফল্য ও সম্মান কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, অথচ অবাধ্য হওয়া কেবল অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়। অতএব, মুসলমানদের উচিত এমন এক প্রান্তে মহান আল্লাহকে উপাসনা করা উচিত নয় যেখানে তারা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর প্রতি আনুগত্য করে এবং কঠিন সময়ে রাগ ও অবাধ্যতার সাথে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা প্রকৃত দাসত্ব বা মহান আল্লাহর আনুগত্য নয়। সহজ কথায়, কোন কাজই দীর্ঘমেয়াদে মুসলমানদের সাহায্য করবে না যদি তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে না হয়। অবাধ্যতা কেবল একটি অসুবিধা থেকে অন্য অসুবিধা, একটি অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 147:

"তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন [অর্থাৎ লাভ] যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস কর?..."

তায়েফ অবরোধ

নম্রতা এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় 30 দিন অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর মুসলিম বাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য দোয়া করেন। সম্ভবত, মহান আল্লাহ তায়েফের মুসলমানদেরকে তায়েফ জয় করতে বাধা দিয়েছিলেন, কারণ মদিনায় হিজরতের আগে, যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফবাসীদের ধ্বংস করার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল কারণ তার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার। কিন্তু তিনি এই বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করবে। এটি সহীহ বুখারি, 3231 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষার এই পছন্দটি অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানদের তায়েফ জয় করতে বাধা দেয়।

উপরন্তু, তায়েফের লোকেরা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া এই দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এবং মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 476-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলমান এটি বুঝতে পারে সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, তবে সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনই শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশী নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় গুণাবলীর উপর কাজ করা উচিত মানুষের সাথে নম্র হয়ে বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

মাইগ্রেশনের পর 9 ম বছর

মহৎ চরিত্র জান্নাতে নিয়ে যায়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল ফালাসের মূর্তি ধ্বংস করার এবং অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন। গোত্র, বানু তাই। অনেক যুদ্ধবন্দীকে বন্দী করে মদিনায় আনা হয়। তাদের মধ্যে হাতেম আল তাইয়ের কন্যাও ছিলেন। যখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিলেন তখন তিনি তাকে মুক্তি দিতে বলেছিলেন এবং আরব উপজাতিদের বিদ্বেষপূর্ণ আস্বাদন থেকে রক্ষা করতে বলেছিলেন কারণ তিনি তার জনগণের নেতার কন্যা ছিলেন। এরপর তিনি তার বাবার কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেন। তিনি তাদের পবিত্র বস্তুর অভিভাবক ছিলেন, তিনি দুর্দশাগ্রস্তদেরকে মুক্ত করতেন, ক্ষুধার্তদের খাওয়াতেন, উলঙ্গকে বস্ত্র পরিধান করতেন, উদার আতিথেয়তা দিতেন, সর্বোত্তম খাবার সরবরাহ করতেন, তিনি শান্তি ছড়িয়ে দিতেন এবং অভাবীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত মুমিনের বর্ণনা যদিও হাতেম আল তাই মুসলিম ছিলেন না। এরপর তিনি তার মেয়ের মুক্তির ঘোষণা দেন এবং মন্তব্য করেন যে তার বাবা এমন একজন ব্যক্তি যিনি মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পছন্দ করতেন এবং মহান আল্লাহ মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পছন্দ করেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, মহৎ চরিত্র ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 92-এ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 191-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে সদয় আচরণ করতে চায় তাকেও অন্যদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে অন্যথায় তারা সফল হবে না কারণ একমাত্র প্রকৃত সফল ব্যক্তিরাই বিশ্বাসী।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের সম্পদকে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে

খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

তাবুকের যুদ্ধ

ঝামেলা মেকার

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলি ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মদিনায় লোকদের দেখাশোনা করার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। মুনাফিকরা তার পিছনে থাকার কারণ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে এবং দাবি করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেখে গেছেন, কারণ তিনি তাকে অপছন্দ করতেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে ব্যথিত হন এবং তারপর মদিনা ত্যাগ করেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং সেখানকার লোকদের দেখাশোনা করার জন্য তাকে মদিনায় ফিরে যেতে বললেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলী (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, যেভাবে হযরত হারুন (আঃ) তাঁর ভাই হযরত মুসা (আঃ) কর্তৃক পদত্যাগ করেছিলেন। সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আর কোন নবী হবেন না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 7-8-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ান তা সত্য হোক বা না হোক এবং এটি মানুষের মধ্যে সমস্যা, ভেঙ্গে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয় কারণ সে সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"ধ্বংস প্রত্যেক বিদ্রূপকারী ও উপহাসকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র সময় গল্প বহন গ্রহণযোগ্য যখন কেউ একটি বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা হয়.

একজন মুসলমানের জন্য এটা কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও..."

একজন মুসলমানের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও একজন গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না।

তাবুকের নবীর খুতবা

একটি ব্যাপক পরামর্শ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানটি যখন তাবুকে পৌঁছে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নোক্ত ভাষণ দেন: "হে মানুষ, সবচেয়ে সত্য কথা হল মহান আল্লাহর কিতাবের। বন্ধনের দৃঢ়তম হল শব্দ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য)। সর্বোত্তম ধর্ম হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। জীবনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। সর্বোত্তম বাণী হল মহান আল্লাহর স্মরণ। সর্বোত্তম বর্ণনা হল পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম অভ্যাস হল যেগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। অভ্যাস খারাপ যারা উদ্ভাবিত হয়. সর্বোত্তম পথনির্দেশ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবচেয়ে মহৎ মৃত্যু হচ্ছে শহীদ হিসেবে। সবচেয়ে অন্ধ হচ্ছে হেদায়েতের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম আমল হল সেই কাজ যা উপকারী। সর্বোত্তম নির্দেশনা হল যা অনুসরণ করা হয় (উদ্ভাবিত নয়)। সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব (আধ্যাত্মিক) হৃদয়ের। উপরের হাত (দানকারী) নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (যে ব্যক্তি দান করে)। যা সামান্য হলেও যথেষ্ট তা তার চেয়ে উত্তম যা অনেক কিন্তু অপচয়কারী। মৃত্যু যখন সামনে থাকে তখন সবচেয়ে খারাপ ক্ষমা চাওয়া হয়। বিচার দিবসে এর চেয়ে খারাপ অনুতাপ। এমন লোক আছে যারা শুধুমাত্র জুমার নামাজের শেষে অংশ নেয়। এমন কিছু লোক আছে

যারা শুধু মহান আল্লাহকে অযথাই স্মরণ করে। গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিহ্বা হল মিথ্যা কথা বলা। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মার (তৃপ্তি)। সর্বোত্তম গুণ হল তাকওয়া। জ্ঞানের পরাক্রম হল মহান আল্লাহকে ভয় করা। অন্তরের মধ্যে সর্বোত্তম গুণ হল নিশ্চিততা (বিশ্বাস)। সন্দেহ করা কুফর থেকে। শোকে বিলাপ করা জাহেলিয়াতের যুগ (প্রাক-ইসলামী যুগ) থেকে একটি কাজ। জালিয়াতি জাহান্নামে ছড়িয়ে মাটির হয়. (বেশিরভাগ) কবিতা শয়তান থেকে আসে। মদ পাপের সমষ্টি। নারী (পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য পুরুষ) শয়তানের ফাঁদ। যৌবন হল উন্মাদনার একটি শাখা (নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে)। সবচেয়ে খারাপ আয় সুদ থেকে। নিকৃষ্ট খাদ্য এতিমের সম্পদ গ্রাস করছে। সুখী মানুষ হল সেই ব্যক্তি যাকে অন্যের (কর্ম) দ্বারা সতর্ক করা হয়। তোমাদের একজনকে পরকালের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য (মৃত্যুর) জন্য চার হাত দূরে সরে যেতে হবে। একটি কর্মের মৌলিকতা তার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল অসত্য। যা আসতে হবে সবই হাতের কাছে। মুমিনের নামে শপথ করা একটি ক্ষোভ। মুমিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফর। তার গোশত খাওয়া (গীবত) মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। তার সম্পত্তির পবিত্রতা তার রক্তের পবিত্রতার মতো। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নামে (মিথ্যা) শপথ করে, সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে। যে তার ক্ষমা চাইবে তাকে ক্ষমা করা হবে। যে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি রাগকে দমন করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার দেবেন। যে ব্যক্তি বিপদাপদে অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষতিপূরণ দেবেন। যে ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে, মহান আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। যে ব্যক্তি অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি শাস্তি দেবেন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। আমি নিজের জন্য এবং আপনার জন্য ক্ষমা চাই।" ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 16-17 এ আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র তীর্থযাত্রাকে শুদ্ধ করা

সত্য ভক্তি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র একজন মুসলমান পবিত্র ইবাদতে অংশ নিতে পারবে। সেই বছরের পর তীর্থযাত্রা। এর আগে অমুসলিমরা পবিত্র তীর্থযাত্রা করত কিন্তু তাদের নিজস্ব ভ্রান্ত রীতিনীতি অনুযায়ী। এই ঘোষণার পূর্বে এবং সে বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র তীর্থযাত্রার দায়িত্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাথির, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 48-49 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, 150-151 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘোষণাটি সর্বজনীন করার জন্য আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তীর্থযাত্রীদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁকে তাঁর কাছ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে নাকি বার্তা দেওয়ার জন্য। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে, তাঁকে শুধুমাত্র একজন রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সুনানে আন নাসায়ী, 2996 নম্বরে একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর বা আলী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা নেতৃত্বে আগ্রহী ছিলেন না, তারা কেবল মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে চেয়েছিলেন। এই আন্তরিকতাই ঈমানের মূল কথা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদের প্রতি আন্তরিকতা। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

সত্যিকারের সৌন্দর্য

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে দুজন লোক ছিল যারা মদিনায় পৌঁছে তাদের ভ্রমণের পোশাক পরিবর্তন করে দামী ও অসামাজিক পোশাক পরে এবং সোনার আংটিও পরিয়ে দেয়। তারা যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল, তখন তিনি তাদের কোন উত্তর দিলেন না এবং তাদের সাথে কথা বললেন না। প্রতিনিধিরা তখন কিছু সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাদেরকে তাদের ভ্রমণের পোশাকে ফিরে যেতে এবং তাদের সোনার আংটি খুলে ফেলার পরামর্শ দেন। যখন তারা তা করল এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে গেল, তখন তিনি তাদের সালামের জবাব দিলেন এবং তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা যখন তাদের অসংযত পোশাক পরে প্রথমবার তার কাছে এসেছিল তখন শয়তান তাদের সাথে ছিল তাই সে তাদের উপেক্ষা করেছিল। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 72-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1999 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেদের সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ উৎসর্গ করতে নিষেধ করে না কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণ বলে

বিবেচিত হতে পারে। সহীহ বুখারী, 5199 নং হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মূল জিনিসটি যা এই পদ্ধতিতে কাজ করাকে অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপ কাজ করার সাথে পার্থক্য করে তা হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি করে। এটি নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল যে নিজেকে সুন্দর করে তোলার ফলে কখনোই আল্লাহ, মহান বা লোকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা উচিত নয় যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। এবং বাস্তবে একজনের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় তা ব্যয়বহুল নয় এবং এটি খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টাও নেয় না।

উপরন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থ, চরিত্রের সাথে যুক্ত। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই টিকে থাকবে যেখানে সময়ের সাথে সাথে একজনের বাহ্যিক সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং উদারতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের সাহায্য করবে। মানুষের অধিকার পূরণে, যেমন তাদের নির্ভরশীলদের।

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মদিনা সফর করে

প্রকাশ্য প্রমাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। একগুঁয়ে খ্রিস্টান পুরোহিতদের সাথে দীর্ঘ বিতর্কের পর, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 61, আয়াতটি প্রকাশিত হয়েছে:

"অতঃপর আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে, বলুন, "এসো, আমরা আমাদের ছেলেদের ও তোমাদের ছেলেদের, আমাদের নারীদেরকে, আমাদের নারীদেরকে, নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে আনি, তারপর আমরা আন্তরিকভাবে দো'আ করি এবং দোয়া করি। [আমাদের মধ্যে] মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, তাদের কোন কারণই হযরত ঈসা (আঃ)-এর দেবত্বে তাদের বিশ্বাসের জন্ম দেয়নি। হযরত ঈসা (আঃ) এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁকে মহান আল্লাহ এক বিশেষ ও অনন্য পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নবুওয়াত প্রমাণের জন্য কিছু অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ) কে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেন। যদি মহানবী ঈসা (আঃ)

ঐশ্বরিক হতেন তাহলে এটা করার কোন প্রয়োজনই থাকত না কারণ কোন স্বর্গীয় সত্তা মৃত্যু অনুভব করেন না। মহান আল্লাহ যেমন তাঁর বান্দাদের সাথে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করেন, হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে এই অসাধারণ আচরণ কিভাবে এই উপসংহারকে ন্যায্যতা দিতে পারে যে তিনি স্বর্গীয়?

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত, হযরত ঈসা (আঃ) সহ সকল নবী-রাসূলগণের মতই।

অবশেষে, পবিত্র কুরআন এমনও প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্বর্গারোহণের পর তাঁর শিষ্যদের ধর্ম একই ছিল, ইসলাম, যা এখন পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত এবং আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে তাঁর আনা ধর্মে নতুনত্বের প্রবর্তন করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠিয়েছেন, যাতে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের নির্দেশিত সরল পথের উপর মানবতাকে পুনর্গঠন করা যায়। এটি কিতাবের লোকদের কাছে স্পষ্ট ছিল যেহেতু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তবুও তারা সম্পদের লোভে এবং সামাজিক মর্যাদার কারণে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করা। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পরেও নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের একগুঁয়েমির প্রতিক্রিয়া হিসাবে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাসকে আরও খণ্ডন করে তাদের একটি পারস্পরিক সমাবেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেখানে উভয় পক্ষই মিথ্যাবাদী দলটির উপর মহান আল্লাহর অভিশাপ প্রার্থনা করবে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারকে ডেকে পাঠালেন, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর স্ত্রী এবং মহানবী মুহাম্মদের কন্যা, শান্তি ও আশীর্বাদ, ফাতিমা এবং তাদের দুই পুত্র হাসান ও হোসাইনকে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোক। এটি প্রত্যক্ষ করার পর খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল এই সমাবেশে অংশ নিতে অস্বীকার করে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে জানতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য কথা বলছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেছেন যে, যদি তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সম্মত হতো তাহলে তাদের উপর আগুন বর্ষিত হতো। ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুজুল, 3:61, পৃষ্ঠা 33-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীর ইবনে কাথির, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 179-180 থেকে উদ্‌ধৃত আরেকটি হাদিস সতর্ক করে যে, যদি তারা সকলেই মহান আল্লাহর অভিশাপের জন্য প্রার্থনা করে, মিথ্যাবাদীদের উপর তাহলে তারা বাড়ি ফিরে তাদের সম্পত্তি বা পরিবার খুঁজে পেত না।

যখন তারা এই পারস্পরিক অভিপ্রায়ে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল তখন এটি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে নাজরানের খ্রিস্টান ধর্মের পুরোহিত এবং নেতারা, যাদের তাদের বিশ্বাসের প্রতি উত্সর্গ খুব পরিচিত ছিল, তারা এমন বিশ্বাস অনুসরণ করেছিল যেগুলির প্রতি তারা সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল ছিল না।

শ্রেষ্ঠ হও

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন, বুরায়দা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি স্বীকার করেছিলেন যে সেই সময়ে তিনি অন্য একজন সাহাবী, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি খারাপ অনুভূতি পোষণ করেছিলেন। এই অভিযানের পর যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টন করা দরকার ছিল এবং তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই কাজের জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পর বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে আসেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করেন, যদিও তিনি কোনো অন্যায় করেননি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপছন্দ করেন, যার উত্তর তিনি সম্মতিতে দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন যে তাকে অপছন্দ না করতে এবং তার পরিবর্তে তার প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি করতে কারণ সে এর যোগ্য। এই মন্তব্যের পর বুরায়দা, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, আন্তরিকভাবে ঘোষণা করলেন যে তিনি আলীকে যতটা ভালোবাসতেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট কাউকেই বেশি ভালোবাসেন না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 142-143-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সর্বকালের সর্বোত্তম দল। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ এই ঘটনা এবং সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রা. , একবার মরুভূমিতে তার পরিবহনে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যোগ করেছেন যে বেদুঈনের পিতা তার পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ক্ষতি করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। একজন সাহাবী, আমর বিন শাস আল আসলামী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যিনি এই অভিযানের অংশ ছিলেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেছিলেন। আমর (রাঃ) যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং বিভিন্ন লোকের সাথে আলাপ-আলোচনায় আলী (রাঃ)-এর সমালোচনা করেন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পেলেন, যিনি তাঁর পাশে বসে না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে তিনি তাঁর ক্ষতি করেছেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষতি করার জন্য তার অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশেষে মন্তব্য করেছেন যে যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সে তার ক্ষতি করেছে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 143-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, অন্যদের তুচ্ছ নেতিবাচক আচরণকে উপেক্ষা করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত মুসলমানরা আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের

দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

উপরন্তু, এই ঘটনাটি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালবাসার নিদর্শন তুলে ধরে, যথা: যারা আল্লাহ, মহান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসেন, তাদের সকলকে ভালোবাসুন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সোল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

সত্য হচ্ছে

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু উট গরীবদের জন্য দাতব্য দান হিসেবে বেছে নেন। তার কিছু লোক জিজ্ঞাসা করেছিল যে তারা এই উটে চড়তে পারবে কি না যাতে তারা তাদের নিজেদের উটকে বিশ্রাম দেয়। কিন্তু তিনি এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তারা দাতব্য অনুদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল শুধুমাত্র অধিকারীরাই তাদের ব্যবহার করতে পারে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 144-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস

থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে

তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

আস্থা দেখাচ্ছে

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, এক টুকরো সোনা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কেউ মন্তব্য করেছেন যে সেই পুরুষদের চেয়ে সোনার উপর তাদের অধিকার বেশি। যখন এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছিল, তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে কি না এবং যোগ করেছেন যে তিনি তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে সকাল-সন্ধ্যা সংবাদ নাযিল করেন তার দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 146-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের আস্থা প্রদর্শন করতে হবে, আন্তরিকভাবে অনুসরণ ও আনুগত্য করার মাধ্যমে, যদিও তার ঐতিহ্যের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে

পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

ইতিবাচকভাবে কর্ম বিচার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, এক টুকরো সোনা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কেউ মন্তব্য করেছেন যে সেই পুরুষদের চেয়ে সোনার উপর তাদের অধিকার বেশি। যখন এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছিল, তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে কি না এবং যোগ করেছেন যে তিনি তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে সকাল-সন্ধ্যা সংবাদ নাযিল করেন তার দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। এর পর এক ব্যক্তি অসভ্যভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, মহান আল্লাহকে ভয় করতে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে তাকে তিরস্কার করেছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহকে ভয় করেন। লোকটা তখন চলে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর ধর্মনিন্দা করার জন্য লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অনুমতি চাইলেন কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই মন্তব্য করে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে লোকটি ফরজ নামাজ আদায়কারী কেউ হতে পারে। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর মন্তব্য করেছিলেন যে তারা প্রচুর লোক ছিল যারা প্রার্থনা করেছিল তবুও মুনাফিক ছিল কারণ তারা মৌখিকভাবে এমন কিছু ঘোষণা করেছিল যা তাদের অন্তরে যা ছিল তার বিপরীত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন জবাব দিলেন যে, তাকে মানুষের অন্তর অনুসন্ধান করতে বা তাদের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করার জন্য তাদের পেট কাটতে আদেশ করা হয়নি। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 146-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই গীবত এবং অপবাদের মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়। সব ক্ষেত্রেই একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দেওয়া থেকে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি তারা ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি এটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়। তাদের ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব এমন জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক এবং অনুভূতির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

ন্যায্য হও

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন তরুণ ছিলেন এবং তাঁর কাছে জ্ঞানের অভাব ছিল তখন তিনি কীভাবে ইয়েমেনে তাঁর কাছে আনা মামলাগুলির সঠিক বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুকে তাঁর হাত রেখে তাঁর জিহ্বাকে দৃঢ় করার জন্য এবং তাঁর হৃদয়কে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। তারপর তিনি তাকে পরামর্শ দেন যে যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তার কাছে বিচারের জন্য আসে তবে সে উভয় পক্ষের কথা না শোনা পর্যন্ত রায় দেবে না। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে এইভাবে আচরণ করা তার কাছে বিষয়গুলি পরিষ্কার করবে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 147-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর নিকট আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।[1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 152-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে যখন তারা তাদের পরকালের শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ, তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত

দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে যে যাত্রার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

সত্যিকারের ত্যাগ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হজ্জের জন্য মোট 100টি উট কুরবানী করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজ হাতে ৬৩টি (তাঁর বয়সের সংখ্যা) কুরবানী করেছিলেন এবং আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আদেশ করেছিলেন বাকি ৩৭টি কোরবানি করার জন্য। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাথির, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 209 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 201।

কোরবানি হল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, যা মুসলমানরা পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) মৌসুমে অনুকরণ করে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কোরবানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 37 সাফফাত, আয়াত 102:

"এবং যখন তিনি তার সাথে পরিশ্রমের বয়সে উপনীত হলেন, তখন তিনি বললেন, "হে আমার বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কুরবানী করব, সুতরাং তুমি কি ভাবছ তা দেখ।" তিনি বললেন, "হে আমার পিতা, আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে তা করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে সবরকারীর মধ্যে পাবেন।"

পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝার প্রথম পাঠ। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহর কাছে যাঁরা তাঁদের চেয়েও বেশি প্রিয়, অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের থেকেও অনেক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষা করা হয়নি।

মুসলমানদের এটাও মনে রাখা উচিত যে তারা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন এটা তাদের জন্য উপকারী। সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো মুসলমান যদি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তবে তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সুতরাং এই হাদিস অনুসারে একজন মুসলিম প্রতিটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে উপকারী, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মুসলমানদের এটাও বোঝা উচিত যে তারা এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যা তাদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, তারা তাতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুক না কেন। ধৈর্যের সাথে এর মোকাবিলা করলে তারা দুনিয়া ও পরকালে অগণিত পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

কিন্তু তারা যদি অধৈর্যতার সাথে এর মোকাবিলা করে তাহলে তারা আরও সমস্যার সম্মুখীন হবে। সুতরাং যেকোন উপায়ে তাদের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে যাতে তারা এটি থেকে উপকৃত হতে পারে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের নির্বোধ হওয়া উচিত নয় এবং উপলব্ধি করা উচিত যে এই পৃথিবী জান্নাত নয়। এটি এমন একটি বিশ্ব যা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে তাই এটি কখনই পরীক্ষা এবং পরীক্ষা মুক্ত হতে পারে না। যখন একজন মুসলিম তার সহজাত প্রকৃতিকে অসুবিধা এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চিনতে পারে তখন তাদের বিস্মিত হয় না কারণ তারা বিশ্বের কাছ থেকে এটি আশা করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি আক্রমণের আশা করে যদি তারা নিজেকে একটি বন্য প্রাণীর সাথে খুঁজে পায় তবে তাদের এই পৃথিবীতে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার আশা করা উচিত। এইভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিলে একজন মুসলিমকে পাহারা দেওয়া থেকে বিরত রাখা হবে যা অধৈর্যতার কারণ।

এই মহান ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ যেভাবে এই জড়জগতে সম্পদ অর্জন করতে পারে না, যেমন কুরবানী ব্যতীত কোনো মুসলমানও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 2:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বলতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের বিচার করা হবে না?

মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের পবিত্র নবী ইব্রাহিম (সাঃ) এবং অন্যান্য নবী (সাঃ) এর মত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে চান না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কোরবানি দিয়েছিলেন সেভাবে মহান আল্লাহও মুসলমানদেরকে কোরবানি করার দাবি করছেন না। তারা তাদের ধন-সম্পদ, বাড়িঘর, পরিবার ও জীবন উৎসর্গ করেছে। পরিবর্তে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে কয়েকটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার জন্য তাদের সময়, শক্তি এবং সম্পদের সামান্য ত্যাগের প্রয়োজন হয়। যদি কেউ জান্নাতের মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারের তুলনায় তারা যে ত্যাগের জন্য উত্সাহিত হয়েছে তা খুবই সামান্য। অতএব, মুসলমানদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

মহানবী ইসমাঈল (আঃ) এর কুরবানী একটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন মুসলমানকে সর্বদা মহান আল্লাহর আদেশের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা এবং ইচ্ছা ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানির আচার-

অনুষ্ঠান মুসলমানরা প্রতি বছর পালন করে। এটি কেবল একটি পশু কোরবানি নয় বরং আরও অনেক কিছু। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 37:

"তাদের গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না এবং তাদের রক্তও পৌঁছাবে না, তবে তাঁর কাছে যা পৌঁছে তা হল তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তিনি তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে পারো।

মুসলমানদের উচিত সারা বছর এই আয়াতে উল্লিখিত তাকওয়া অবলম্বন করা, মহান আল্লাহর নির্দেশকে তাদের কামনা-বাসনার সামনে রেখে। তবেই তারা সঠিকভাবে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারবে।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলমানের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের দিকনির্দেশনাকে বিশ্বাস করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ঘটবে তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা উত্তম যা কেবলমাত্র আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন একজন ব্যক্তি কিছু পাওয়ার পরে অনুশোচনা করতে চেয়েছিলেন। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদি তারা কঠিন থেকে মুক্তি পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

মাইগ্রেশনের 11 তম বছর

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা

নেতৃত্বের ইচ্ছা এড়িয়ে চলুন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, পরোক্ষভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যিনি তাঁর পরে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না এবং তিনি নেতা হিসাবে নিয়োগ পেতে বলবেন না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 326-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পালের উপর।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু

আল্লাহর প্রতি ভক্তি (SWT)

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর অসুস্থতার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দ্বারা গৃহীত হবে না যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর বিশ্রামের স্থান দেখতে পান এবং জীবনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়। এবং মৃত্যু। সহীহ বুখারী, 4428 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছিলেন যে কয়েক বছর আগে খায়বারে তাকে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল এবং অনুভব করেছিল যে এটি থেকে তিনি মারা যাবেন। এটা ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। তার অন্তিম মুহুর্তে, তিনি আকাশের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরেন এবং সর্বোচ্চ সঙ্গীর কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল 63 বছর। তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল একটি উঁচু জায়গায়, জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 343-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর

ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে

এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। পরিস্থিতি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে চিরতরে স্বস্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে একটি উঁচু স্থানে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"... আশা করা যায় যে তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এবং অধ্যায় 93 আদ দুহা, আয়াত 4-5:

" এবং পরকাল তোমাদের জন্য প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম। আর তোমার প্রতিপালক তোমাকে দিবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তার জাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং উভয় জগতের সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে ও আখেরাতে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে তা থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন। সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর শেষ রাসুল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

সাঃ) এর মৃত্যুর পরের জীবন

আবু বক্কর (রাঃ) এর ভাষণ

বাধ্য থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাদের তীব্র দুঃখের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুতে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং হযরত মুসার মতোই ফিরে আসবেন। তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর সম্প্রদায়কে চল্লিশ দিনের জন্য রেখেছিলেন।

হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন সেখানে পৌঁছেন তখন তিনি মসজিদে নববীতে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 144 পাঠ করলেন:

“মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া নন। [অন্যান্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে আপনি কি ফিরে যাবেন [অবিশ্বাসের দিকে]? আর যে তার গোড়ালিতে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

অতঃপর নিম্নোক্ত কথাটি বললেন: “আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেন। সুউচ্চ, সরল, তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আপনাকে পথের উপর ছেড়ে দিলেন। এবং স্পষ্ট নিদর্শন এবং ব্যথা ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না. যাদের রব আল্লাহ, পরাক্রমশালী তাদের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত করত, তাদের জানা উচিত যে তিনি মারা গেছেন। মহান আল্লাহকে ভয় কর হে মানুষ! তোমার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমার প্রভুর উপর ভরসা কর। মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ। মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সমর্থন করে এবং যারা তার ধর্মকে সম্মান করে। মহান আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে রয়েছে। এটি আলো এবং নিরাময় উভয়ই। এর দ্বারা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত দান করেছেন। এতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কী হালাল মনে করেন আর কোনটি হারাম। সৃষ্টির মধ্য থেকে কে আমাদের উপর (আমাদের আক্রমণ করার জন্য) অবতীর্ণ হয় তা আমরা পরোয়া করব না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জোরালোভাবে লড়াই করব যেভাবে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে লড়াই করেছি।

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর তারা সবাই সত্যকে মেনে নিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা ঘোরা বোধ করেন এবং মাটিতে পড়ে যান এবং অবশেষে স্বীকার করেন যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে মারা গেছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 348-349 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 139-141-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর (রাঃ) এর খেলাফত

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এ সময় মক্কা ও মদিনা থেকে আগত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হন। সহীহ বুখারী, 3667 এবং 3668 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হল ভাল বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এটি এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের খলিফা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনকি উমর ইবনে খাতাব নামও রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য এটি ছিল কোনো যুক্তি বা সমস্যা ছাড়াই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিক কাজটি করতে বেছে নেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেন। তিনি চিন্তা করেননি যে তিনি অন্য কাউকে সমর্থন করলে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে বা তাকে ভুলে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক পছন্দের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। যারা ভালো কিছু করে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা প্রায়শই শুধুমাত্র যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করে। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। কেউ কেউ আরও নীচে নেমে গেছে এবং তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের খারাপ কাজে সমর্থন করে এবং অপরিচিতদের যারা ভাল করছে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুর চিন্তা না করে সর্বদা কল্যাণের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে শক্তি ও সম্মান চায়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমনকি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দের পছন্দ ছিল, তবুও তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মনোনীত করেননি। এর একটি কারণ হল, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু এবং নতুন নেতা মনোনীত করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,

নেতৃত্বের জন্য তর্ক করবেন এবং লড়াই করবেন নাকি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন কিনা তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা। ইতিহাস পরিষ্কারভাবে দেখায়, তারা উড়ন্ত রঙের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অতএব, এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল এবং ভবিষ্যত মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল যে তারা সর্বদা অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হয়। উপরন্তু, যদি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিযুক্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কিছু লোক সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর নিয়োগে সর্বসম্মতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তারা কেবলমাত্র তারা এটা মেনে নিয়েছে কারণ তারা তা করতে আদেশ করেছিল। অতএব, একটি সুস্পষ্ট আদেশ এড়ানোর অনুমতি দেওয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বাধা দেয় কারণ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলির অধীনে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হতে হবে। . এটি খলিফা হিসাবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকারকে আরও বৃদ্ধি করেছিল, যেমনটি তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। .

ঐক্য

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হওয়ার পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের কোনো ইচ্ছা না থাকায় তিনি পদত্যাগ করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রকাশ্যে এই আবেদন করেছিলেন এবং এটি ছিল আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কেউ তার পদত্যাগ চায়নি এবং তারা তার পদত্যাগ গ্রহণ করবে না। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে কিভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সকল পরিস্থিতিতে অন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে রেখেছিলেন, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় জামাতের নামাজের নেতৃত্ব দেওয়া। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারিতে পাওয়া একটি, নম্বর 682। সমস্ত সাহাবী আলীর সাথে একমত হন এবং আবু বকরকে জোর দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের নেতৃত্ব দিন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, 212 পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পরে, তাঁর খিলাফতের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেছে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রত্যেকেই তাদের ধর্মে (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় তাদের জামাতের নামাজে নেতৃত্ব দিয়ে) এবং তাই সমস্ত সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের পার্থিব বিষয়ও। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 5 এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তারা এমন আচরণ করেছিলেন যেভাবে তারা মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা কল্যাণের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে যাতে তারাও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে একত্রিত হয়।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো

গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান

করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক

জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

একজন আন্তরিক উপদেষ্টা

আবু বক্কর, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সকলের একজন সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হন। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 216-217 এ আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের শুরুতে, খলিফা নিজেই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটি ছিল আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যিনি তাকে মদিনায় থাকতে এবং কোন অভিযানে যোগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন যে, মুসলমানরা তাকে হারিয়ে ফেললে এর পর ইসলাম আর কখনোই উন্নতি করবে না। আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আন্তরিক পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

যখন অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, প্রথমে আবু বক্করের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন (যারা বাধ্যতামূলক দাতব্য দিতে অস্বীকার করেছিল) আলী রা. তিনি তাদের কাছ থেকে ফরজ সদকা গ্রহণ করেননি তাহলে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি অনুসরণ করবেন না। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 217-218-এ আলোচনা করা হয়েছে।

একইভাবে, তাঁর খিলাফতের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি অভিযানের সাথে মদিনা ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন কারণ এটি স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করবে। হুমকির মধ্যে ইসলামী জাতি. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 254-255-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র

নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

প্রথম খলিফা আবু বক্কর (রাঃ)-এর মৃত্যু

অন্যদের সমর্থন

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পরে, মদীনাবাসীদেরকে প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং উমর ইবনে খাত্তাবকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন, আল্লাহ খুশি হতে পারেন। ইসলামের পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার সাথে। তারা সবাই ঘোষণা করলেন যে তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনবে এবং মান্য করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বকর আস সিদ্দীক, পৃষ্ঠা ৭২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি বর্ণনা অনুসারে, উমর ইবনে খাত্তাব নামকরণের আগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে কিনা। আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, দাঁড়িয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু না হলে তারা খুশি হবে না। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৭১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, একজন সত্যবাদী মানুষ ছিলেন, তিনি সত্যকে সমর্থন করেছিলেন যেখানেই এটি মিথ্যা বলেছিল।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়।

ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

একটি n সৎ প্রশংসা

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর, মদিনা শোকে ডুবে গিয়েছিল, যেমনটি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর সময় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিল। আলী ইবনে আবু তালিব আবু বক্করের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং নিম্নলিখিত প্রশংসা করেন: "হে আবু বকর, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী এবং বন্ধু ছিলেন। আপনি তার জন্য একটি সান্ত্বনা ছিলেন এবং যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। যদি তার কোন গোপন কথা থাকত, তবে সে তা তোমাকে বলত; এবং যদি তার কোন বিষয়ে কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় তবে সে আপনার সাথে পরামর্শ করবে। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আপনি তাদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আন্তরিক ছিলেন। আপনার ঈমান অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী ছিল, যেমন আপনি মহান আল্লাহকে ভয় করতেন। আর আপনি দ্বীনি জ্ঞানে অন্য সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিলেন। আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলাম উভয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান ছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে আপনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী; আপনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন; আপনার সেরা অতীত ছিল; আপনি সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছেন; এবং আপনি তার সবচেয়ে কাছের ছিলেন। এবং সমস্ত লোকের মধ্যে আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, তাঁর দিকনির্দেশনা ও আচরণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। আপনার পদমর্যাদা অন্য সবার চেয়ে উচ্চতর ছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সম্মান করতেন এবং আপনাকে অন্য সবার চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় রাখতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলামের পক্ষ থেকে, আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। লোকেরা যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন তোমরা তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছিলে। সারা জীবন তুমিই ছিলে তার চোখ যা দিয়ে সে দেখেছে আর কান দিয়ে শুনেছে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে আপনাকে সত্যবাদী নাম দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন:

"এবং যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন [হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং [যারা] তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন [আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু] - তারাই সৎকর্মশীল।" অধ্যায় 39 আজ যুমার, আয়াত 33।

মানুষ যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের সমর্থনে কৃপণ ছিল, তখন আপনি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। এবং যখন লোকেরা স্থির হয়ে বসেছিল, তখন আপনি তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যে কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কঠিন সময়ে, আপনি সত্যিই তার একজন ভাল এবং মহৎ সঙ্গী ছিলেন। তুমি দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়, গুহায় তার সঙ্গী; এবং যার উপর প্রশান্তি নেমে এসেছে:

“যদি আপনি তাকে [নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সাহায্য না করেন - আল্লাহ ইতিমধ্যেই তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে [মক্কা থেকে] দু'জনের একজন হিসাবে বের করে দিয়েছিল, যখন তারা গুহায় ছিল এবং সে [মক্কা থেকে] নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সঙ্গী [আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু]কে বললেন, "দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" এবং আল্লাহ তার উপর তার প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাকে সৈন্যদের দ্বারা সমর্থন করেছেন [অর্থাৎ, ফেরেশতাদের] যাদের আপনি দেখেননি..." তওবাহের অধ্যায় 9, আয়াত 40।

আপনি হিজরতের সময় (মদিনায়) তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং মহান আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর জাতির ব্যাপারে তাঁর উত্তরসূরি ছিলেন। এবং আপনি সত্যই একজন উত্তম উত্তরসূরি প্রমাণিত হয়েছিলেন যখন লোকেরা ধর্মত্যাগ করেছিল। আপনি যা করেছেন তা আপনার পূর্বে অন্য কোন নবী (সাঃ) এর খলিফা করেননি । আপনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে দাঁড়ালেন যখন তাঁর অন্যান্য সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাদের সংকল্প হারিয়েছিলেন এবং নরম হয়েছিলেন। আর যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন আপনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতিনীতি মেনে চললেন। আপনি সত্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আপনার শরীরে দুর্বল, কিন্তু মহান আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে শক্তিশালী; নিজের মধ্যে নম্র, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা উচ্চতর; মানুষের চোখে সম্মানিত, তাদের অন্তরে সম্মানিত এবং মহান। তাদের একজনেরও আপনাকে অপছন্দ করার, আপনাকে সন্দেহ করার বা আপনাকে অবজ্ঞা করার কোনো কারণ ছিল না। আপনি সর্বদা দুর্বল এবং নম্রদেরকে শক্তিশালী এবং সম্মানজনক হিসাবে বিবেচনা করেছেন, নিশ্চিত করেছেন যে আপনি তাদের যা সঠিকভাবে তাদের দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে আপনি আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সাথে সমান আচরণ করতেন। সমস্ত মানুষের মধ্যে, আপনি তাদেরকে সম্মান করতেন যারা মহান আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি আনুগত্য করতেন এবং যারা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। আপনার সামগ্রিক চরিত্রে, আপনি সত্য এবং সহানুভূতি মূর্ত করেছেন। আপনার বক্তৃতা সর্বদা প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবং আপনি সর্বদা ভদ্রতা এবং দৃঢ়তার মধ্যে একটি মহৎ ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। আপনি সর্বদা জ্ঞানের উপর আপনার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এবং একবার আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, আপনি সর্বদা সেগুলি কার্যকর করার জন্য দৃঢ় সংকল্প রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে আমরা মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর আদেশের কাছে নতি স্বীকার করি। আর মহান আল্লাহর কসম, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল ব্যতীত, মুসলমানরা

আপনার মৃত্যুর বিপর্যয়ের চেয়ে বড় বিপদে আর কখনও পড়েনি। আপনি সর্বদা এই ধর্মের রক্ষাকর্তা, একটি অভয়ারণ্য এবং সম্মানের উত্স ছিলেন। মহান আল্লাহ আপনাকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে যোগদান করুন এবং তিনি যেন আমাদেরকে আপনার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না করেন এবং আপনার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন।" তাঁর প্রশংসা শুনে লোকেরা সাড়া দিয়ে ঘোষণা করে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী , ৭৩৬-৭৩৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত

একজন পরামর্শক

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে, আলী ইবনে আবু তালিব, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একজন সিনিয়র উপদেষ্টা এবং প্রিয় বন্ধু হিসাবে বিবেচিত হন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এমন আইনি মামলা বা সমস্যা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন যা আলী রা. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 245-246-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে মহিলারা আর আলীর মতো পুত্র সন্তান ধারণ করতে পারে না, এবং যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর সন্তুষ্ট না হতেন তবে তিনি হতেন। সর্বনাশ ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 248-249-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

ইসলামিক ক্যালেন্ডার

একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দলিল পেয়েছিলেন যাতে শুধুমাত্র মাসটি লেখা ছিল। তাই, নথিতে উল্লেখিত বছর তিনি কাজ করতে পারেননি। তারপর তিনি একটি ইসলামী ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য প্রবীণ সাহাবীগণকে একত্র করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের ক্যালেন্ডার শুরু হওয়া উচিত যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 225-227-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল ঐক্যের আরেকটি কাজ, যা উমর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং আলীর দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ সেই সময়ের লোকেরা অতীতের ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে সময়ের বিচার করবে, যার মধ্যে কিছু প্রাক-ইসলামী যুগের সাথে যুক্ত ছিল। অজ্ঞতা। ইসলামিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন এটি এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব

ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয় , যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর

অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি

অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

মহৎ আচরণ

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য এবং সিনিয়র সাহাবীগণ, খলিফা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে সদ্য বিজিত জমিগুলিকে ভাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সৈনিকরা। তিনি প্রথমে কিছু সাহাবীদের কাছ থেকে কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনায় সম্মত হন। আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা শুরু থেকেই তার সাথে একমত ছিলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিবর্তে অমুসলিমদের তাদের জমি রাখার অনুমতি দেন এবং তাদের উপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আরোপ করেন। অমুসলিমরা তার সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিল কারণ এটি তাদের জীবনে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিল যে তারা, শাসক শ্রেণী নয়, কৃষি জমির মালিক। পূর্ববর্তী শাসনামলে, এই অমুসলিমরা ছিল কেবল শ্রমিক যারা জমি চাষ করত এবং বিনিময়ে কার্যত কিছুই পেত না। সমস্ত আয় শাসক শ্রেণী গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে পয়সা থাকবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত এই অমুসলিমদেরকে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিত্রতার জন্য উৎসাহিত করেছিল এবং তাদের অনেকেই তাঁর খেলাফতের কারণে সারা দেশে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 466-467 এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 251-252-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে তা নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"... বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

তাঁর খিলাফতকালে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকেরা যদি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর পরে খলিফা নিযুক্ত করে তাহলে তিনি তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করবেন, এমনকি যদি মানুষ অনিচ্ছুক ছিল। এমনকি তাকে ছুরিকাঘাত করার পরেও, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন যে, লোকেরা যদি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করে, তিনি তাদের সরল পথে পরিচালিত করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 252-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন দুর্দান্ত নেতা ছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে

কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

বিশ্বস্ত হওয়া

যখনই খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা থেকে চলে যেতেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সর্বদা এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিয়োগ করতেন। তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে একাধিকবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 253-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

আশীর্বাদ পালন

খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব একবার ইয়ানবুতে কিছু জমি আলী ইবনে আবু তালিবকে বরাদ্দ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জমিও কিনেছিলেন এবং জলের সন্ধানে জমি খনন করেছিলেন। সেই জমিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়েছিল এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সমস্ত জমি গরীব ও অভাবীদেরকে দান করেছিলেন। তিনি দানপত্রের নথিতে নিম্নলিখিতটি লিখেছেন: "এগুলি তার সম্পদের নিষ্পত্তির বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিবের নির্দেশাবলী: আমি ইয়ানবু, ওয়াদি আল কুরা, আল আধনিয়াহ এবং রাআহ এর জমিগুলি দান করি। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যুদ্ধ ও শান্তির সময়, নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়দের জন্য তা থেকে ব্যয় করা। এটা বিক্রি করা বা দেওয়া বা উত্তরাধিকারী নয়, আমি বেঁচে থাকি বা মৃত। আমি এর দ্বারা মহান আল্লাহর মুখমন্ডল এবং পরকালের গৃহ কামনা করি। আমি এ ছাড়া আর কিছুই চাই না যে, মহান আল্লাহ তা কবুল করুন এবং এর উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি উত্তম উত্তরাধিকারী। এটা আমার এবং মহান আল্লাহর মধ্যে একটি চুক্তি, এটা সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 258-259-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ

অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর শাহাদাত

উসমান ইবনে আফফানকে খলিফা নির্বাচিত করা

শাসন

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে

তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবী অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। , যা সে রাজি। যখন তাকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার আহ্বান জানানো হয়, তখন তিনি তাদের উপদেশ দেন যে নিম্নলিখিত ছয় জনের মধ্য থেকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করা হবে, যাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর আগে সন্তুষ্ট করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উমর জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র, আবদুল্লাহ বিন উমর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিফা নিযুক্ত হবেন না তবে তিনি পরবর্তীটি বেছে নিতে সহায়তা করতে পারেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, শোয়েব আর রুমিকেও নিযুক্ত করেছিলেন, পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য। তিনি পরবর্তী খলিফা হতে বেছে নেওয়া ছয়জনের মধ্যে একজনকে নামাযের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কারণ এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এক প্রকার অনুমোদন হতে পারে, পরবর্তী খলিফা কে হবেন। নির্বাচনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে চাননি তিনি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 398-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে পরবর্তী খলিফা হতে বাধা দিয়ে রাজাদের প্রথা এড়িয়ে গেছেন, যদিও তিনি এর যোগ্য ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র এই কাজের জন্য সেরা পুরুষকেই চেয়েছিলেন তাই ছয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন যারা খলিফার ভূমিকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি ইঙ্গিত করে যে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষের প্রতি কতটা আন্তরিকতা ছিল।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে

অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

একটি ফাইন রোল মডেল

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর তাঁকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে, তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে তিনি পছন্দ করবেন এমন কেউ নেই। সহীহ বুখারী, ৩৬৮৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একটি ভাল রোল মডেল বেছে নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তবুও তাঁর অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে এই সমালোচনার ভিত্তি। মিথ্যা ছাড়া কিছুই না। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই

একজনের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনেই প্রকৃত সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তার ব্যতীত অন্য কোন পথ বেছে নেয় তবে তারা যা কিছু কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভালো সাহচর্য

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর তাঁকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে, তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি সর্বদা মনে করতেন যে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর দুই সাহাবীর সাথে রাখবেন, অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু সা. বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যেমন তিনি প্রায়শই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিজের, আবু বক্কর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একত্রে উল্লেখ করতে শুনেছেন। সহীহ বুখারী, ৩৬৮৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে তার ভালো সাহচর্য আখিরাতে ভালো সাহচর্যের দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর খেলাফত

তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর এবং তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি যে ছয়জনকে মনোনীত করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, একটি বৈঠক করেন। আব্দুর রহমান, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে শাসনের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে তিনজন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আয জুবায়ের আলীর পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তালহা উসমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সা'দ আব্দুর রহমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অধিকার ছেড়ে দেন এবং বাকি দুজনকে, অর্থাৎ আলী ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সঙ্গীর পক্ষে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। দুজনেই চুপ করে থেকে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। তারপর আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাদের কাছ থেকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কে হবেন পরবর্তী খলিফা। তারা উভয়েই তার পরামর্শে রাজি হন। অবশেষে, আব্দুর রহমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উসমানের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তাঁর পরে আনুগত্যের অঙ্গীকারকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এরপর বাকি লোকেরাও তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে তারা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছিল এবং জাগতিক কারণে উদ্‌বুদ্ধ ছিল না এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিল।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা

ইসলামের প্রথম তিন খলিফা হিসাবে আবু বক্কর, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এর মনোনয়ন সবসময়ই অনেক বিতর্কের বিষয় ছিল। ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিতরা প্রায়শই ইসলামের প্রথম তিন খলিফা হওয়ার অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাতে দুটি দলকে সত্যের উপর একত্রিত করা যায়: সুন্নি এবং শিয়া। যদিও এটি একটি যোগ্য লক্ষ্য, তবুও গড়পড়তা মুসলমানদের এই আলোচনা বা অন্যান্য অনুরূপ আলোচনা যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, কারণ এই বিষয়গুলি মহান আল্লাহ তায়ালা চান। বিচার দিবসে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 141:

“এটি এমন একটি জাতি যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিকভাবে পরিচালিত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 100:

“আর মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে হিজরতকারী) এবং আনসার (মদিনার অধিবাসী) মধ্যে [ঈমানে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সদাচরণে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় প্রাপ্তি।"

যেহেতু বিচার দিবসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার এবং তার উপর আমল করার পরেই কি তাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের অধিকার আছে? যেহেতু কার্যত কেউই এই স্তরে পৌঁছায়নি, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবে, অর্থাত্ যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে।

পরিশেষে, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের ধার্মিক ব্যক্তিত্বকে অপবাদ দেওয়া বোকামি, কারণ তারা পবিত্র কোরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন। এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের মাধ্যমে হেদায়েতের এই দুটি উৎসকে রক্ষা করেছেন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই আমরাই বাণী [কুরআন] নাযিল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক হব।"

অতএব, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে তবে তারা পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে, যা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তার কাফের হওয়ার ভয় পাওয়া উচিত, যেমন কাফেররা সাহাবীদের অপছন্দ করে, পবিত্র কুরআন অনুসারে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 29:

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তার সাথে যারা [সাহাবায়ে কেরামগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট হন] তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জোরদার, নিজেদের মধ্যে দয়ালু। আপনি তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও [তাঁর] সন্তুষ্টি কামনা করে রুকু ও সিজদা করতে দেখেন। সিজদার প্রভাব [অর্থাৎ নামায] থেকে তাদের চেহারায় তাদের চিহ্ন। তাওরাতে তাদের বর্ণনা রয়েছে। এবং ইঞ্জিলের মধ্যে তাদের বর্ণনা এমন একটি উদ্ভিদের মতো যা তার শাখাগুলি তৈরি করে এবং তাদের শক্তিশালী করে যাতে তারা দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ডালপালাগুলির উপর দাঁড়ায়, বীজ বপনকারীদের খুশি করে - যাতে তিনি [অর্থাৎ, আল্লাহ] তাদের দ্বারা ক্রুদ্ধ হন [সাহাবীগণ, আল্লাহ হতে পারেন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট] কাফেররা..."

কুরআন সংগ্রহ করা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলে অনেক মুসলিম হতাহতের ঘটনা ঘটে, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আবু বক্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই ভয়ে পবিত্র কুরআন বই আকারে সংগ্রহ করতে যে আয়াতগুলি মুখস্থ করলে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের যুদ্ধে মারা যাওয়া বা শহীদ হওয়া অব্যাহত রয়েছে। এর আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো কোনো একটি বইয়ে ছিল না, বরং সেগুলো হয় মুখস্থ করা হতো বা বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা হতো, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন মানুষের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- এর খিলাফত পর্যন্ত, মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন পাঠ করা জায়েয ছিল বিভিন্ন উপভাষা অনুযায়ী। সাতটি ভিন্ন উপভাষায় প্রকাশিত। এটি এর আবৃত্তিতে নমনীয়তার জন্য অনুমতি দেয়। কিন্তু আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সময় হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া ও ইরাক থেকে আগত সৈন্যদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এই পার্থক্যগুলি বিশেষ করে অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তারা আপত্তি করতে পারে যে তেলাওয়াতের পদ্ধতির সাথে তারা পরিচিত ছিল না। তাই তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আসেন এবং মুসলিম জাতিকে একটি তেলাওয়াতে জড়ো করার অনুরোধ করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পর এতে সম্মত হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের কেউই তার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি পবিত্র কুরআনের ভৌত কপি পাঠালেন যা মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিল; এই সংস্করণের কপি তৈরি; এবং তাদেরকে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে প্রেরণ করেন এবং তাদের তিলাওয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন, যা ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর গোত্র কুরাইশদের পাঠের পদ্ধতি। এটি সহীহ বুখারী, 4987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন কিছু বিপথগামী লোক উসমানের কাজের সমালোচনা করত, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রক্ষা করতেন এবং লোকেদের সতর্ক করতেন শুধুমাত্র তার সম্পর্কে ভালো কথা বলার জন্য। তিনি লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সমস্ত সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার পর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লোকদেরকে শুধুমাত্র একটি তেলাওয়াতে জড়ো করেছিলেন। আর তিনি একই কাজ করতেন, যদি তিনি সেই সময়ে খলিফা হতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 280-281-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পবিত্র কুরআন পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সর্বদা পবিত্র কুরআনকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে,

তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

উপরন্তু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকাণ্ড ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব

ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর

অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি

অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

ধৈর্য অবলম্বন করা

যখন উসমান ইবনে আফফান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁকে অনেক সাহাবী সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা তাঁকে যুদ্ধ করতে এবং বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় সংকল্প, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখনই বৃদ্ধি পায় যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে, তিনি ইন্তেকালের পর অশান্তি শুরু হবে। তাদের কষ্ট দাও। যখন তারা তাকে নিরাপত্তা লাভের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং তার দলের সাথে নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়া উচিত এবং তারপর মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বিদ্রোহীদের রক্ত ঝরাতে বা তাঁর জন্য তাদের রক্ত ঝরাতে অনুরোধ করেছিলেন। এক পর্যায়ে উসমানের সাথে 700 জনেরও বেশি আন্তরিক মুসলমান ছিল, যার মধ্যে সাহাবীগণও ছিলেন, যেমন আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সবাই তাকে যুদ্ধ ও রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু তিনি তাদের নিষেধ করেছিলেন।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি চেয়েছিলেন কারণ তিনি কোন অন্যায় করেননি এবং জোর দিয়েছিলেন যে তার সাথে 500 জন আন্তরিক মুসলমান রয়েছে যারা তার সাথে যুদ্ধ করবে, তবুও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি চাননি যে

তার খাতায় রক্ত ঝরে যাক। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 287-288-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্রোহীরা যখন উসমানের কাছে খাবার ও পানি পৌঁছাতে বাধা দেয়, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে পানি পৌঁছে নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশাল ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং অনেক আন্তরিক মুসলমান আহত হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 288-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল মুগীরাহ ইবনে শুহবাহ উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, হয় যুদ্ধ করতে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ডানদিকে ছিলেন অথবা মক্কায় পালিয়ে যান যেখানে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে বিদ্রোহীরা সেখানে তাকে আক্রমণ করবে না বা সিরিয়ায় পালিয়ে যেতে যেখানে গভর্নর রক্ষা করবেন। তাঁর অর্থ, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে তিনি প্রথম মুসলিম নেতা হতে যাচ্ছেন না যিনি মুসলমানদের রক্তপাত করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি মক্কায় পালিয়ে গেলেও তারা এটি আক্রমণ করবে। আর তিনি কখনোই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শহর থেকে সিরিয়া বা অন্য কোন স্থানে পালিয়ে যাবেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী, উসমান ইবনে আফফান, ধুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা ৫৪৭-৫৫১-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা সর্বোত্তম হয়, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য দেখাতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা

করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কোরান স্পষ্ট করে বলেছে যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে এটি ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য প্রদর্শন করা। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

পরিশেষে, জীবনে একজন মুসলমান সর্বদা হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত

নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর শাহাদাত

খলিফার আত্মত্যাগ

তীর্থযাত্রার মরসুম শেষ হলে অনেক তীর্থযাত্রী খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের গভর্নরদের দ্বারা অনেক সৈন্যও পাঠানো হয়েছিল। বিদ্রোহীদের নেতারা এটি শুনেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে তাদের শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার অন্যথায় তারা বিরোধিতার দ্বারা পরাস্ত হবে। তাঁর শাহাদাতের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রোজা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বপ্নে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দেখেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাদের সাথে ইফতার করতে বলেছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তিনি সেদিন মারা যাবেন। উসমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, জানতেন যে তিনি একজন শহীদ হতে চলেছেন এবং তাই তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য কাউকে অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে আরও সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ এটি তার জীবন রক্ষা না করে শুধুমাত্র রক্তপাত এবং অনৈক্য ঘটাবে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং কিছু সহিংসতা শুরু হলে যুদ্ধ না করার জন্য তাঁর বাড়িতে অবস্থানকারী আন্তরিক মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পর, আন্তরিক মুসলমানদের শেষ পর্যন্ত চলে যেতে রাজি করায়, কিছু বিদ্রোহী উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং যখন তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন তখন তাঁকে আক্রমণ করে। তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল এবং সেও এনকাউন্টারে আহত হয়েছিল। এমনকি তিনি তাদের দিকে চিৎকার করে বলেছিলেন যে তারা এমন

একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় যে সারা রাত জেগে নামাজের এক চক্রে পুরো পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তাতেও দুষ্টদের নিবৃত্ত করা যায়নি। তারা খলিফা উসমান ইবনে আফফানকে শহীদ করে , এবং তার রক্ত পবিত্র কুরআনের 2 অধ্যায়, 137 নং আয়াতে ছিটকে পড়ে:

“ সুতরাং তারা যদি বিশ্বাস করে যেভাবে আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে তারা [সঠিক] পথপ্রাপ্ত হয়েছে; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা কেবল মতভেদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করার পর, তারা তার বাড়ি এমনকি সরকারী কোষাগার লুটপাট করে, যদিও এতে কার্যত কিছুই ছিল না কারণ উসমান রা.

এই ঘটনাটি ঘটেছিল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরতের ৩৫ তম বছরে, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল ৮২ বছর।

সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁর শাহাদাতে গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন এবং মৌখিকভাবে তাদের হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, যেমন সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেছিলেন

এবং তারপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহামানব, ঝামেলাকারীদের পাকড়াও করতে। এবং তার প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং বিদ্রোহীদের সকল নেতাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-106:

" বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কাজের ব্যাপারে অবহিত করব? [তারা] তারাই যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" তারাই যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবং আমরা কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন [অর্থাৎ গুরুত্ব] নির্ধারণ করব না। এটা তাদের প্রতিফল - জাহান্নাম - যার জন্য তারা অস্বীকার করেছিল এবং [কারণ] তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং আমার রসূলদেরকে উপহাস করেছিল।"

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত শোকাহত ও ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি এতটাই রাগান্বিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর ছেলে হাসানকে চড় মেরেছিলেন এবং তাঁর অপর ছেলে হুসেনকে আঘাত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যখন তিনি তাদেরকে খলিফার দরজায় দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি খলিফার দরজায় অবস্থানরত অন্যদেরও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের অভিশাপ দেন এবং খলিফার হত্যায় তার নির্দোষ ঘোষণা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 288-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, এমনকি উসমানকে হত্যাকারী বিদ্রোহীদের বর্ণনা করার সময় নিম্নলিখিত আয়াতগুলি উদ্ধৃত করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 16-17:

“[তারা] শয়তানের উদাহরণের মতো যখন সে মানুষকে বলে, অবিশ্বাস কর। কিন্তু যখন সে অবিশ্বাস করে, তখন সে বলে, "নিশ্চয়ই আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" সুতরাং তাদের উভয়ের পরিণতি হল তারা জাহান্নামে থাকবে, সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই জালেমদের প্রতিদান।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উসমান ইবনে আফফানের জীবনী, ধুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা 571-580-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর খেলাফত

আরও অশান্তি

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত আরও বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এই ঘটনার কারণে মুসলিম জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অনেক বিপর্যয় ঘটে। দুষ্টরা জয়লাভ করলো এবং ধার্মিকরা পরাজিত হলো। মন্দ কাজকারীরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আরও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ধার্মিকরা তা কাটিয়ে উঠতে ভালকে ছড়িয়ে দিতে অক্ষম হয়। সকল সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনুগত্য করেছিলেন, যিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি আরও অনৈক্যের আশঙ্কা করেছিলেন এবং সেই সময়ে পরবর্তী খলিফা হওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন তিনি। এবং যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের মধ্যে সেরা ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐক্য ভেঙ্গে যায় এবং কোন শৃঙ্খলা অবশিষ্ট ছিল না এবং নতুন খলিফা এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তারা কল্যাণ ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যা চেয়েছিলেন তা অর্জন করতে সক্ষম হননি।

বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্ভাসিত দুটি আধ্যাত্মিক রোগ বাকী জাতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে: সন্দেহের পরীক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষা। সন্দেহের বিচার ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতার কারণে ঘটে যা ঈমানের দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়। ঈমানের দুর্বলতা থাকলে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া সহজ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের ভুল

ব্যাখ্যা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করে তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়। এটি এমনকি ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। উপরন্তু, এটি একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আশার পরিবর্তে ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তার মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করা, তবুও বিশ্বাস করা যে তিনি ক্ষমা করবেন।

আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষায় পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া জড়িত। তাদের কামনা-বাসনা তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত লাভ, ভোগ ও সঞ্চয় করতে এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী হলে, তারা একজনকে অবৈধ এবং এমনকি সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের জন্য অন্যের ক্ষতি করার জন্যও প্ররোচিত করতে পারে। আকাঙ্ক্ষা একজনকে মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি বেছে নেওয়ার জন্য উত্সাহিত করে, যার ফলে কেউ তাদের ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুসারে মেনে চলে এবং উপেক্ষা করে। এই ব্যক্তি এমনকি তাদের ইচ্ছা পূরণের ন্যায্যতার জন্য ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে। পরকালকে উপেক্ষা করা একজনকে তাদের জবাবদিহিতা মনে রাখতে বাধা দেয় এবং যখন এটি ঘটে তখন যে কোনও কাজ করা সম্ভব হয়।

সন্দেহ এবং আকাঙ্ক্ষা উভয় পরীক্ষারই নিরাময় হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা এবং তার উপর আমল করা, যাতে একজন ব্যক্তি ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এটি সন্দেহ এবং আকাঙ্ক্ষার পরিণতির বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে কাজ করে।

যদিও ইসলামী জাতির মধ্যে অশান্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তবুও তা খলিফা, আলী ইবনে আবু তালিব এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকতে বাধা দেয়নি। . কিন্তু যারা গোমরাহীর উপর অটল থেকেছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করেছে তারা দুনিয়াতে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম থেকে রেহাই পায়নি এবং আখেরাতে অবশ্যই তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তারাও। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 227:

"...এবং যারা অন্যায় করেছে তারা জানতে পারবে তারা কি [ধরনের] প্রত্যাবর্তন করবে।"

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

নেতৃত্বের জন্য লালসা

উসমান ইবনে আফফানের শাহাদাতের পর, সমস্ত সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, স্বেচ্ছায় আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাদের অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে তাঁর আনুগত্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন , যিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে তিনি খলিফার ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 315-316-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলি, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, নিঃসন্দেহে খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন অবশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে প্রথম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মুসলিম হওয়ার জন্য, সবচেয়ে জ্ঞানী, মহানবী মুহাম্মদের সবচেয়ে কাছের। সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক বংশের দিক থেকে, সবচেয়ে সাহসী, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, মহান ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যোগ্যতায় সর্বোত্তম, সর্বোত্তম, মর্যাদায় সর্বোচ্চ এবং যিনি আচরণ ও চরিত্রে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তাই তিনি খিলাফতের জন্য অন্য কারো চেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। একটি সত্য সকল সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এছাড়াও সাক্ষ্য. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 318-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি সেই সময়ের সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকে খণ্ডন করেননি। তিনি মন্তব্য করেন যে তিনি জানতেন যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চেয়ে উত্তম এবং তাঁর চেয়ে খিলাফতের অধিকার বেশি ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর ইস্যুটি ছিল উসমান ইবনে আফফানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ চাওয়ার উপর ভিত্তি করে, খলিফা হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ না করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 325-327-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, নেতৃত্ব কামনা করেননি কারণ তিনি এর সাথে সম্পর্কিত পরীক্ষার ভয় পেয়েছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিচার প্রণয়ন

উসাম ইবনে আফফানের শাহাদাতের পরের দিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং আন্তরিক মুসলমানরা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে, শান্তি ও শান্তি। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তিনি পরবর্তী খলিফা হতে নারাজ কিন্তু লোকেরা জোর দিয়েছিল যে তাকে মেনে নেওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাদের সমর্থন ছাড়া তার কোন কর্তৃত্ব নেই এবং তাদের সম্পদের চাবি এখন তার কাছে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জনগণকে বাদ দিয়ে একটি রূপার কুণ্ডলীও নিজের কাছে রাখার অধিকার তার নেই। এমনকি তিনি তাদেরকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে তাদের মন পরিবর্তনের সুযোগও দেন কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তারা সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। তারপর তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের কর্তব্য ছিল তাঁর আনুগত্য করা এবং তিনি সঠিক পথ অনুসরণ করতে এবং ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 328-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা

তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।[1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

পারস্পরিক প্রেম

যদিও অনেক অজ্ঞ লোক আবু বকর, উমর ইবনে খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে একে অপরের প্রতি মিথস্ক্রিয়া এবং আচরণ যে তাদের মধ্যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে যে কোনও খারাপ অনুভূতি শুধুমাত্র স্বার্থপরতা এবং লোভকে নির্দেশ করবে - নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তারা মুক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার চেয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের প্রতি সদাচরণ পছন্দ করেন। এটি সহীহ বুখারী, 4036 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী ও অধিক প্রিয় ছিলেন এবং যারা ইসলামের জন্য অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে সকল বিষয়ে করেছেন। ন্যায়বিচারের পরিপন্থী নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার উসামা বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর নিজের পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর তুলনায় সরকারি কোষাগার থেকে অধিক সম্পদ বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁর ছেলে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করল তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, উসামার পিতা যায়েদ বিন হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তারপর তাঁর পিতা (অর্থাৎ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর সাথে) এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকেও বেশি প্রিয় ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী,

উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 248-249-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলীর পুত্র এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতি হুসাইন বিন আলীকে তাঁর সাথে সময় কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। . যখন তিনি তার বাড়িতে পৌঁছেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, কীভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমরকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি, যিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন, এবং তাই তিনি ফিরে গেলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে প্রবেশের অনুমতি ছাড়াই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন তখন তিনি হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে, তাঁর কাছে প্রবেশ করার অধিকতর অধিকার তাঁর নিজের পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তার সাথে সন্তুষ্ট। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, মানুষ যে আশীর্বাদ দান করেছে তা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের কারণে দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 256-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সরকারী কোষাগার থেকে জনগণকে কতটা নিয়মিত ধন-সম্পদ দেওয়া হবে, তখন তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে জনগণকে বরাদ্দ করেছিলেন। যদিও তাকে নিজেকে এবং তার নিজের পরিবার থেকে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 257-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সহ সকল সাহাবীকে ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এমনকি তাঁর কন্যা, উম্মে কুলতুমকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতনিকে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ করেছিলেন। তার সাথে সন্তুষ্ট। আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এমনকি প্রথম তিন খলিফার নামে তাঁর সন্তানদের নাম রেখেছেন: আবু বক্কর, উমর এবং উসমান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এমন আচরণ করবে যার সাথে তারা পছন্দ করে না বা তার সাথে চলতে পারে? ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 258-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর একবার আলী ইবনে আবু তালিবের মাথায় চুম্বন করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং প্রার্থনা করেন যে, মহান আল্লাহ যেন তাকে এমন দেশে না রাখেন যেখানে আলী (রা) অনুপস্থিত ছিলেন।

উসমানের খিলাফতের সময়, আলী, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একজন সিনিয়র উপদেষ্টা এবং প্রিয় বন্ধু হিসাবে বিবেচিত হন। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 216-217 এ আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর খিলাফতকালে, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন

যে তার ভাই এবং প্রিয় বন্ধু উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তা দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করেন, তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 258-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অবশেষে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম খলিফা হওয়ার নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি আবু বক্কর বা উমর ইবনে খাত্তাবকে অনুমতি দিতেন না। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে দাঁড়ানো। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, এমনকি তার চাদর ছাড়া তাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো কিছু না থাকলেও, কারণ তিনি কখনই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবেন না। আলী, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত খলিফা সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তারা সকলেই খলিফা হিসাবে তাদের মনোনীত হওয়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 215-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসেন তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 1

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 334-335-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ একটি নির্দেশনামূলক গ্রন্থ নাযিল করেছেন যাতে তিনি ভাল এবং মন্দ ব্যাখ্যা করেছেন। তাই মানুষকে ভালো কাজ করতে হবে এবং মন্দ থেকে দূরে থাকতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি

সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও

অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার জন্য লোকদের উপদেশ দিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারির ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর মানুষকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন, যাতে তিনি তাদের জান্নাতের দিকে পরিচালিত করেন।

সহীহ বুখারী নং 6502-এ পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনে প্রচেষ্টা চালায়, মহান আল্লাহ, তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আশীর্বাদ করে যাতে তারা তার আনুগত্যের জন্য তাদের ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলমান কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন যে, মহান আল্লাহ পবিত্র সীমা স্থাপন করেছেন যা অজানা নয়।

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং বেশিরভাগ হারাম জিনিস, যেমন মদ পান করা সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে তাই তাদের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলমানের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানের পবিত্রতাকে অন্য সব পবিত্র সীমার চেয়ে বেশি পবিত্র করেছেন।

সহীহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সফলতা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা জরুরী।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জন করার চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, যদিও তাদের অর্জিত জিনিসটি একটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে তাদের অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা উচিত এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা উচিত। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন যে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ভক্তি ও তাঁর একত্বের ভিত্তিতে একত্রিত করেছেন।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়ীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা

দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, বৈধ কারণ ছাড়া। বৈধ কারণ ব্যতীত মুসলমানদের ক্ষতি করা বৈধ নয়।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের অবশ্যই সাধারণ জনগণের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা সেইভাবে আচরণ করেন যেভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব বা ধার্মিক যা-ই হোক না কেন অন্যের জন্য এ ধরনের কষ্ট লাঘব করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় পান করাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ তারা অন্যকে সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন তার সফল পরিণতি নিশ্চিত হয়। তাই, মুসলমানদের উচিত নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন যে শেষ ঘন্টা তাদের পিছনে রয়েছে এবং শীঘ্রই তাদের ধরবে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন

আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন যে তাদের এই জড় জগতের প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখাতে হবে যাতে তারা ধার্মিক লোকেদের সাথে যোগ দেয়।

এই জড় জগত এবং পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি এবং উপলব্ধি গ্রহণ করলে এটি অর্জিত হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন যে, তারা যদি ভালো কিছু দেখেন তবে তারা এগিয়ে যান এবং তা করবেন কিন্তু যদি তারা খারাপ কিছু দেখেন তবে তাদের অবশ্যই তা ত্যাগ করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য মুসলমান যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের এখনও সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও তাদের সেগুলি সম্পাদন করার আগে কিছু চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

সততা এবং নম্রতা

মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া রাহিমাহুল্লাহ একবার তার পিতা আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর শ্রেষ্ঠ মানুষ কে ছিলেন? আলী আবু বক্কর সিদ্দিক এবং তারপর উমর ইবনে খাত্তাব নাম রাখেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন তার ছেলে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল যে তিনি (অর্থাৎ, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমরের পরে সর্বোত্তম ছিলেন, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উত্তর দিলেন যে তিনি মুসলমানদের মধ্যে একজন মানুষ মাত্র। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4629 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি দাবি করে যে তিনি আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাবের চেয়ে উত্তম, তাহলে তিনি তাদের অপবাদের আইনি শাস্তির আওতায় আনবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 219-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, অহংকারমুক্ত ছিলেন এবং তাই এই বিষয়ে সত্য কথা বলতে কোন সমস্যা ছিল না। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সত্য নির্দেশনা মেনে চলুন

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে নির্দেশনার দুটি উত্স যথা, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার আহ্বান জানাবেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে জনগণকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে (যার মধ্যে পবিত্র কুরআন অনুসরণ করা অন্তর্ভুক্ত), কারণ এটি সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা এবং তাদের অবশ্যই তার ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হবে। উপায় সেরা.

তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি কারো মতামতের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য ত্যাগ করবেন না।

আরেকটি অনুষ্ঠানে, তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি একজন মহানবী (সা.) নন, এবং তিনি ঐশী ওহী পাননি কিন্তু তিনি কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করেছেন। তাকে, যতটা সে পারে।

একটি খুতবার সময় তিনি একবার লোকদেরকে দ্বীন মেনে চলার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা ও ঐতিহ্য অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, তারা পবিত্র কুরআনে যা কিছু বোঝেনি তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা উচিত এবং এটি যা অনুমোদন করেছে,

তাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং এটি যা অপছন্দ করেছে, তাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

অন্য একটি খুতবায় তিনি লোকদের বলেছিলেন যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলি আরও খারাপ বিষয়। আর যে উদ্ভাবন করে সে পথভ্রষ্ট হয় এবং কোন উদ্ভাবক বিদআত প্রবর্তন করে না কিন্তু তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 115-117 এবং 119-120 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার

এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

তথ্য যাচাই করা হচ্ছে

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকেরা ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর আমল করা নিশ্চিত করার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর একটি শাখা ছিল অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও নির্ভুল তা নিশ্চিত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি মানুষকে শেখানোর জন্য তিনি যিনি দাবি করেন যে তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন বা দেখেছেন, তাকে শপথ করতে বলবেন যে তারা সত্য বলছে। তিনি এমন আচরণ করেননি যেভাবে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সততা নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বরং তিনি অন্যদের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তারা যে জ্ঞান শিখেছেন এবং তার উপর আমল করেছেন তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য তিনি এটি করেছিলেন। সঠিক এবং নির্ভুল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 117-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি থেকে একজনকে তথ্যের উপর কাজ করার আগে বা অন্যদের সাথে শেয়ার করার আগে তথ্য যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি শিখতে হবে।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে অসত্য খবরের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি

একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একটি দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয় যা এখনও অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই বিষয়ে অমনোযোগী এবং এটি যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে তথ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি মুসলমানদের কীভাবে প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা শুধুমাত্র সমাজে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে যাচাই করা তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয় না তা জেনেও তারা ত্যাগ করবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

Asceticism সংজ্ঞায়িত

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি অতীতের জন্য শোক করে না এবং (অতিরিক্ত) তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য (অতিরিক্ত) আনন্দ করে না সে সম্পূর্ণ অর্থে সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছে। শব্দ অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 111-112-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যারা এইভাবে আচরণ করা এড়িয়ে চলে তারা তা করে কারণ তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় জড় জগতের সাথে সংযুক্ত থাকে না এবং এটিই তপস্বী।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের

উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই একজন মুসলিম যার কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী মানুষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কাজগুলি তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলমানকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলমান এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের হৃদয়কে সমস্ত নিরর্থক ও অকেজো পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলমান জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

মহানবী (সাঃ) কে ভালবাসা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তাদের কাছে তাদের চেয়েও প্রিয় ছিলেন। সম্পদ, সন্তান, পিতা, মা এবং তৃষ্ণার্ত ঠান্ডা জল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 123-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বাসের প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 165 নম্বর, উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি তখনই ঈমানের মাধুর্য আস্বাদন করবে যখন সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। . সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত আরেকটি হাদিস, 168 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই সত্যের কারণে মুসলমানরা সবাই দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসে। কিন্তু এটি একটি দাবি যা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা আবশ্যক। অন্যথায় মহান আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য থাকবে না।

পবিত্র কোরআনে ভালোবাসার নিদর্শন বলা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, কেউ যদি মহান আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর ভালোবাসা ও ক্ষমা কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই বাস্তবিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মোহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুকরণ করার চেষ্টা করতে হবে, তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর ঐতিহ্যকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। তাদের অবশ্যই তার আদেশ পালন করতে হবে এবং তার নিষেধ এড়িয়ে চলতে হবে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

“...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন তা নাও; এবং তিনি আপনাকে যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাকুন..."

একজনকে তার ঐতিহ্য থেকে বাছাই করা উচিত নয় এবং শুধুমাত্র তাদের আচরণে প্রয়োগ করা উচিত যখন এটি তাদের জন্য উপযুক্ত। যে ব্যক্তি এটি করে সে কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করছে। এই ভুল মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন হল যে, একজন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত কর্মের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে অগ্রাধিকার দেবে, যা তাঁর অন্যান্য কর্মের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 5363 নম্বর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর পরিবারকে বাড়ির কাজে সাহায্য করতেন কিন্তু নামাজের সময় হলে তিনি ইমামতি করতে চলে যেতেন। মসজিদে জামাতের নামাজ। যদি কেউ তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করে কিন্তু বৈধ অজুহাত ছাড়া জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত না হয় তবে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। এর কারণ তারা কর্মের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করেছে। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ঘরের কাজে সাহায্য করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। এবং যদি একজন ব্যক্তি এই অগ্রাধিকারটি পুনরায় সাজায় তবে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। নিজের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা নিঃসন্দেহে একটি উত্তম কাজ কিন্তু তারা যদি এমন আচরণ করে তাহলে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি অনুসরণ করছে না, যদিও তা মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মুসলমানদের বুঝতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, এর মানে এই নয় যে মুসলমানদের সৎ কাজ করা বন্ধ করা উচিত। এর অর্থ হল তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

জান্নাতের পথ

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা মানুষকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উত্সাহিত করতেন। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে কেউ কিছু না জানলে শিখতে খুব বেশি লজ্জা বোধ করা উচিত নয়।

অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি মানুষকে জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন এবং এর ফলে তারা এর জন্য পরিচিত হবে এবং তারা যাতে জ্ঞানী মানুষ হয় সেজন্য তার উপর আমল করা উচিত।

তিনি একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে জ্ঞানের প্রকৃত বাহক তিনিই যে তারা যা শিখে তার উপর আমল করে এবং যার কাজ তাদের জ্ঞান অনুসারে হয়।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে জ্ঞান এর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য কর্মের ডাক দেয়। যদি কর্ম সাড়া দেয় (তাহলে ভাল) অন্যথায়, জ্ঞান চলে যায়।

তিনি অন্যদের সাথে দেখা করার সময় মানুষকে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে উত্সাহিত করেছিলেন।

তিনি লোকদের জ্ঞান শিখতে উত্সাহিত করেছিলেন যা দরকারী ছিল। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে জ্ঞান শেখা যায় তার চেয়ে বেশি, তাই জ্ঞানের প্রতিটি শাখা থেকে যা ভাল তা নেওয়া উচিত।

আলী যখন শহীদ হন, তখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তাঁর মৃত্যুতে ইসলামী আইনশাস্ত্র ও জ্ঞান হারিয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 344-347-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির

দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

একজন গভর্নরের পরামর্শ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার তাঁর মিশরের একজন গভর্নরকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 564-565-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তার যদি দুটি বিষয় মোকাবেলা করার থাকে, একটি যা পরকালের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যটি যা এই জড়জগতের সাথে সম্পর্কিত, তবে তাকে তা দিয়ে শুরু করা উচিত যা রয়েছে। পরকালের সাথে করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয়, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে

হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার ভাল করার প্রবল ইচ্ছা থাকা উচিত এবং তাকে সর্বদা সঠিক নিয়ত অবলম্বন করা উচিত, কারণ মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে তাদের নিয়ত অনুসারে দান করেন।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারির ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য তার প্রভুকে রাগান্বিত করা উচিত নয়।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের

বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহূর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি অন্যায়কারীর প্রতি কঠোর এবং ধার্মিকদের সাথে নম্র আচরণ করবেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলমানের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তা পরিহার করা এবং অন্যদেরকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি ধার্মিকদেরকে নিজের কাছাকাছি আনতে হবে এবং তাদের নিজের অভ্যন্তরীণ বৃত্ত এবং ভাই হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা

আলী ইবনে আবু তালিব, একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মানুষ যা পাওয়ার কথা ছিল না তা মিস করতে পেরে বিরক্ত হবেন। এবং তিনি যা মিস করতে পারেননি তা পেয়ে তিনি খুশি। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত আখেরাতের ব্যাপারে যা অর্জন করেছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং তারা যা হারিয়েছে তার জন্য তার অনুশোচনা করা উচিত। তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি প্রাপ্ত করে তার জন্য একজনের উল্লাস করা উচিত নয় এবং তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি হাতছাড়া করে তার জন্য তাদের দুঃখ করা উচিত নয়। মৃত্যুর পরে কী হবে তা নিয়ে তাদের আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 580-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে মানসিক চাপ এড়াতে সাহায্য করতে পারে তা হল একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থা গ্রহণ করা। এটি তখনই যখন কেউ তাদের আবেগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যে তারা নিজেকে চরম মানসিক অবস্থা অনুভব করতে দেয় না কারণ এটি প্রায়শই চাপ এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। পবিত্র কুরআনের 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ ইঙ্গিত করা হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

ইসলাম কাউকে আবেগ দেখাতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানুষের একটি অংশ। কিন্তু এটি মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার পরামর্শ দেয় যেখানে কেউ এক চরম আবেগ থেকে অন্য আবেগে না যায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দু: খিত হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে হতাশ হওয়া উচিত নয়, যা চরম দুঃখ, কারণ এটি প্রায়শই বিষণ্নতার মতো অন্যান্য মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। এবং সুখী হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে অতিরিক্ত সুখী হওয়া উচিত নয়, উল্লাস করা, কারণ এটি প্রায়শই উভয় জগতে পাপ এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে। একজন মুসলমানের উচিত কঠিন সময়ে তাদের কাছে থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলিকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অর্জনের চেষ্টা করা যা চরম দুঃখকে বাধা দেয়, যেমন হতাশা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের খুশি করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং যদি তারা এটির অপব্যবহার করে বা এর সাথে যুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা এর জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। এটি একজনকে অত্যধিক সুখী হতে বাধা দেবে, যেমন উল্লাসিত।

মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা সর্বদা সর্বোত্তম যা চরম মেজাজের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে। এটি একজন মুসলিমকে প্রকৃত মানসিক শান্তি এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর সমস্ত কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় না করার জন্য বিশেষ করে, যারা ইসলামী জাতির তত্ত্বাবধানে এবং সুরক্ষার অধীনে রয়েছে তাদের প্রতি অন্যায় না করার জন্য অনুরোধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার তার কর্মচারীদের একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা জনগণের কোষাগারের রক্ষক। অতএব, তাদের প্রয়োজন মেটাতে এবং তারা যা চায় তা চাইতে কাউকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন তারা জমির কর আদায় করে, তখন তারা তাদের শীত বা গ্রীষ্মের পোশাক, তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো মাউন্ট বা কোনো চাকর বিক্রি করতে বাধ্য করবে না। তারা সম্পদের জন্য কাউকে বেত্রাঘাত করবে না এবং মুসলিম বা অমুসলিম কারও সম্পদকে অন্যায়ভাবে স্পর্শ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 603-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো

অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত

বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

অন্যদের সাহায্য করা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তাঁর একজন গভর্নরকে এমন একজনকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের কাছে তিক্ত সত্যের কথা উচ্চারণ করতে পারে এবং আল্লাহ যে বিষয়ে তাদের জন্য সবচেয়ে কম সহায়ক, গভর্নরকে খুশি করুক বা না করুক তা নির্বিশেষে উচ্চতর, অস্বীকৃতি জানায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 605 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি সৎ এবং আন্তরিক সহচর থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক এখনও পরীক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে, তাদের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করে না। যদিও, অনেক সম্ভাব্য কারণ আছে শুধুমাত্র একটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে.

কিছু ক্ষেত্রে, লোকেরা ভালভাবে পরিবর্তিত হয় না কারণ তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের এটি করতে উত্সাহিত করে না। আসলে, অনেকেরই এই অভ্যাস আছে শুধুমাত্র অন্যের পিঠে থাপ্পড় দেওয়া এবং তারা যা শুনতে চায় তা বলে। তারা একরকম বিশ্বাস করে যে এটি একটি ভাল সঙ্গী এবং বন্ধুর চরিত্র। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এইভাবে অভিনয় করা অন্যদের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার লক্ষণ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ এই আচরণ শুধুমাত্র একজনকে উন্নতি

না করে তাদের মনোভাব চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। অন্যদের মানসিক সান্ত্বনা প্রদানে কোন ভুল নেই তবে একজন ভাল বন্ধু সর্বদা দয়া করে তাদের বন্ধু বা আত্মীয়রা তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে পারে এমন উপায়গুলি নির্দেশ করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গীর দুনিয়া ও পরকালের জীবনের মান ও অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। শুধুমাত্র অন্যদের পিঠে থাপ্পড় দিলে তাদের কেবল সাময়িক আরাম পাওয়া যাবে কিন্তু কোনোভাবেই পরিস্থিতি বা তাদের চরিত্রের উন্নতি হবে না। অন্যকে অসম্মান না করে সঠিক মনোভাব অর্জন করা সম্ভব। এটি অন্যদের প্রতি একজন ব্যক্তির বিশেষত, তাদের আত্মীয়দের কর্তব্য। বাস্তবে, যদি একজন ব্যক্তির বন্ধু বা আত্মীয় তাদের ভাল পরামর্শ অপছন্দ করে তবে তারা তাদের সাথে তাদের সম্পর্ককে মূল্য দেয় না। একজন ব্যক্তির কখনই কিছু হতে দেওয়া উচিত নয়, যেমন একজন ব্যক্তির বয়স, তাকে সত্য বলতে বাধা দেয় এবং ভালোর জন্য তাদের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য দয়া করে পরামর্শ দেয়। এমনকি যদি এটি নিজের পিতামাতার হয় তবে তাদের এখনও এই দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এই আচরণটি তাদের সাথে সদয় আচরণ করার সারাংশ। কেবলমাত্র তারা একজনের পিতামাতা হওয়ার কারণে কেবল চুপচাপ থাকা একজন ব্যক্তির মনোভাব হওয়া উচিত নয় যদি না তারা জানে যে তাদের পরামর্শ দেওয়া প্রত্যেকের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে।

কান্নার জন্য কাঁধ তখনই কার্যকর যখন এটি একজন ব্যক্তিকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করে। এমনকি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির মনোভাব সঠিক না হয় তবে পরিস্থিতি থেকে তারা সবসময় শিক্ষা নিতে পারে, যা অন্যদের দ্বারা তাদের কাছে নির্দেশ করা উচিত।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই অন্যদের ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র অন্যের পিঠে চাপ দিয়ে মানসিক সমর্থন প্রদান করতে হবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

ট্রাস্ট পূরণ করা

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা তিনি অন্যদের সাথে যে শান্তি চুক্তি করেছিলেন তা পূরণ করতেন এবং তার গভর্নরদেরকেও তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি একবার তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা যদি তাদের শত্রুর সাথে একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছায় এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করে তবে তাদের অবশ্যই চুক্তির শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই সৎ এবং আন্তরিক হতে হবে এবং মূল্য নির্বিশেষে চুক্তিটি মেনে চলতে হবে, কারণ মহান আল্লাহর বাধ্যবাধকতাগুলির মধ্যে এমন কিছুই নেই যে সমস্ত লোক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতার পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করতে সম্মত হয়, এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তির পূর্ণতা অপেক্ষা. সুতরাং তাদের কখনই তাদের চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয় এবং কখনও তাদের শত্রুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারও নেই, কারণ চুক্তিগুলি তাঁর বরকতময় নামে করা হয়, শুধুমাত্র অজ্ঞ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 608-609-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান

আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

অন্যদের মনিটরিং

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, নেতৃত্বের পদে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের স্বাধীন রাজত্ব দিতেন না। তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের মাধ্যমে ক্রমাগত তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন।

আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, অনেক পরিদর্শক ছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল গভর্নরদের তত্ত্বাবধান করা এবং গভর্নররা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করা। তারা, পরিবর্তে, তাদের দায়িত্ব সর্বোচ্চ মানদণ্ডে পূর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক সহায়তা ছিল।

তিনি তার গভর্নর এবং জনগণের বিষয় সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শহরে গুপ্তচর পাঠাতেন। তিনি তার গভর্নরদের একই কাজ করার নির্দেশ দেবেন, যার ফলে গভর্নরদের কর্মচারীরা ভয় থেকে আন্তরিক থাকবেন তা নিশ্চিত করবেন।

তিনি জনগণের বিষয়ে তার গভর্নরদের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 468 এবং 613-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর আচার-আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার আদায় করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয় । পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

সহজ জিনিস মেকিং

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতেন এবং তাঁর গভর্নরদেরকেও তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার তার গভর্নরদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের অধীনে থাকা জনগণকে তাদের সম্পর্কে সদয় আচরণ করা, তাদের উপর বোঝা হ্রাস করা এবং তাদের বাইরে এমন কিছুতে বাধ্য করা থেকে বিরত থাকার চেয়ে তাদের সম্পর্কে আরও ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার জন্য একজন নেতা কিছুই করতে পারে না। . এইভাবে আচরণ করা পারস্পরিক আস্থা ও ইতিবাচক চিন্তার পরিবেশ তৈরি করবে এবং এটি অনেক ঝামেলা প্রতিরোধ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 617-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি

ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলমান অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ

বিবাদ সংশোধন

খলিফা উসমান ইবনে আফফান শহীদ হওয়ার পর, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন যেখানে তারা মুমিনদের মা আয়েশা বিনতে আবু বক্কর (রা.) এর সাথে দেখা করেন। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুনিদের খোঁজে বের হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিল, যাতে তার জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ ও ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। এটা স্পষ্ট ছিল যে সমস্ত সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, খলিফার মৃত্যুর জন্য নিজেদেরকে দায়ী করেছিলেন কারণ তারা মনে করেছিল যে তাদের তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল। তাই তারা তার খুনিদের বিচার করতে আগ্রহী। আয জুবায়ের, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করেছিলেন যে যদি তার হত্যার আইনত প্রতিশোধ নেওয়া না হয় তবে এটি ভবিষ্যতে বিদ্রোহীদের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করতে আরও সাহসী করে তুলবে এবং তারা তাদের অপছন্দের নেতাদের হত্যা করতে উত্সাহিত হতে পারে। তাদের সমর্থন ছিল অনেক মুসলমান যারা উসমানের প্রতি অনুগত ছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যেমন তাঁর আত্মীয়রা যারা মদিনা ছেড়ে মক্কার দিকে রওনা হয়েছিল এবং বসরার গভর্নর, যিনি মক্কায় ছিলেন। অন্যরা যারা উসমান (রাঃ)-কে সাহায্য করার জন্য তাদের শহর ছেড়েছিল, তারাও মক্কায় পৌঁছেছিল এবং তাদের সমর্থন দিয়েছিল। তারা সবাই মক্কা ছেড়ে বসরার দিকে রওনা হয়, যেটি ছিল বিদ্রোহীদের অন্যতম প্রধান শহর। তারা শুধুমাত্র উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী আইন অনুযায়ী আইনি প্রতিশোধ নিতে এবং যা ঘটেছিল তা জনগণকে অবহিত করতে চেয়েছিল কারণ অধিকাংশ ঘটনাই বিদ্রোহীরা প্রেক্ষাপটের বাইরে মোচড় দিয়েছিল এবং তারা ছিল। মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য

সৃষ্টির জন্য অনেক মিথ্যা বানোয়াট। তারা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত, ইসলামী সাম্রাজ্যের ন্যূনতম সংঘাত এবং ক্ষতির সাথে এবং সবকিছু ঠিকঠাক না করা পর্যন্ত লোকদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর লক্ষ্য ছিল।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আয়েশা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, নিম্নলিখিত আয়াতের বিরোধিতা করেননি, কারণ তিনি কিছু ভাল করার জন্য তার বাড়ি ছেড়েছিলেন। আয়েশা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, এমনকি তার অভিযানে যোগদানের কারণ স্পষ্ট করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতটি উদ্‌ধৃত করেছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

এবং একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তার বাড়ি ছেড়েছিলেন যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছিলেন, মদিনায় তার বাড়ি থেকে দূরে একটি যাত্রা, যা কেউ আপত্তি করেনি। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 33:

"এবং তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং নিজেদেরকে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের মত প্রদর্শন করো না..."

আয়েশা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, এই অভিযানে সাথে থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছিল কারণ মুসলমানরা বিশ্বাস করেছিল যে তার উপস্থিতি যুদ্ধ রোধ করবে এবং মুসলমানদেরকে পুনর্মিলন করতে এবং দ্রুত জিনিসগুলি ঠিক করতে উত্সাহিত করবে, কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বাসীদের মা, তার স্ত্রী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে খলিফাকে আক্রমণ করা এবং হত্যা করা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ, কারণ খলিফা হলেন মহান আল্লাহর প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, এটি উপেক্ষা বা উপেক্ষা করা যাবে না।

একবার বসরায় পৌঁছে অনেক মুসলমান তাদের কাজে যোগ দেয় এবং অন্যরা যোগ দেয়নি। যারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটতে পারে এমন কোনো দ্বন্দ্বের ভয়ে ভীত ছিল না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাই কোনো পক্ষ বেছে নেওয়া এবং কোনো সাহাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। উপরন্তু, যারা তাদের সাথে যোগ দেয়নি তারা শুধুমাত্র খলিফা, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিশ্বাস করেছিল, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য আইনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি অভিযান পরিচালনা করার অধিকার ছিল এবং তাই তারা তার অনুমতি ছাড়া গুরুতর কিছু করার ইচ্ছা ছিল না।

সমস্যা সৃষ্টিকারীদের কিছু নেতা যেমন হুকাইম ইবনে জাবলাহ তার সাথে কিছু লোক নিয়ে এসে আয়েশা, তালহা ও আয যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের উপর হামলা চালায়। এই সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের অনুসারীদেরকে আক্রমণ না করার এবং শুধুমাত্র আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই সমস্যা সৃষ্টিকারীরা কেবল আরও বিবাদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা স্পষ্ট করে বলেছিল যে, তারা শুধুমাত্র উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিচার চাইছে এবং অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। এই গুণ্ডারা আয়েশাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার জন্য দায়ীদের অনেকেই নিহত হন।

আয়েশা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, বসরায় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তা জনগণকে জানানোর জন্য অন্যান্য শহরগুলিতে চিঠি লিখেছিলেন এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন, যেহেতু তিনি সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করতেন, যতক্ষণ না এটি করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ভূখণ্ডে শান্তি ও ঐক্য আর একবার ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 38-59-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খলিফার হিজরত

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যিনি মদিনায় ছিলেন, সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সাথে আলাপ করার জন্য সিরিয়ার দিকে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি ইরাকে চলে যাওয়ার কথাও ভাবছিলেন যাতে তিনি অশান্তির কাছাকাছি যেতে পারেন এই আশায় যে তিনি এটি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, মদিনায় থাকতে এবং শুধুমাত্র চরম পরিস্থিতিতে চলে যেতে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তার আসল মতে ফিরে আসেন এবং কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তাকে জানানো হয় যে, আয়েশা, তালহা, আয জুবায়ের এবং অন্যান্যরা বসরার দিকে যাচ্ছেন। মদিনার অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উসমান (রা)-এর হত্যার কারণে তখনও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আরও অনৈক্য ও অশান্তির ভয়ে মদিনায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং আলীর সাথে যোগ দেননি। , আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. এই সাহাবীদের মধ্যে অনেক, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এমনকি বিচারের দিনে তারা মহান আল্লাহর কাছে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে না এমন কিছুতে জড়িত হওয়ার ভয়ে তাদের ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।

তাঁর পুত্র হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁকে মদীনা ত্যাগ না করার পরামর্শ দেন, তখন তিনি উত্তর দেন যে, তিনি যদি তাঁর দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ না দেন, তবে তাঁর পক্ষ থেকে কে তা পালন করবে?

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, কুফাবাসীদেরকে তার অভিযানে তার সাথে যোগ দিতে উত্সাহিত করার জন্য লিখেছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের গভর্নর আবু মুসা আল আশআরীকে মান্য করতে বেছে নিয়েছিলেন, যিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন। অশান্তির এই সময়ে জড়িত না হওয়া এবং লড়াই না করা। কিন্তু আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করার পর, আম্মার বিন ইয়াসির, হাসান ইবনে আলী এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ আরও কিছু সাহাবী আলীর সাথে যোগদানের জন্য লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন। তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাদের নেতা এবং খলিফা, যাতে তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারেন। ফলে কুফার বহু লোক তার সাথে যোগ দেয়।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর বাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে যখন তারা আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়েরের সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য বসরার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মোকাবেলা করা। তাদের দয়ার ভিত্তিতে এবং যতটা সম্ভব সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য, এই আশায় যে তারা তাদের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকবে এবং তাকে, খলিফা, উসমানের হত্যাকারীদের সাথে মোকাবিলা করতে দেবে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর সাথের লোকদের বলেছিলেন যে তিনি কেবল আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়েরের সাথে জিনিসগুলি ঠিক করতে চান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যদি তারা তার কথায় সাড়া না দেয় তবে তিনি তাদের একা ছেড়ে দেবেন এবং তার থেকে মতপার্থক্য গ্রহণের অধিকার স্বীকার করবেন এবং তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করবেন। যতক্ষণ না তারা তাকে একা রেখে যাবে ততক্ষণ তিনি তাদের একা রেখে যেতেন এবং তিনি কেবল আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করবেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথের লোকদের কাছে স্বীকার করেছেন যে আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ন্যায়বিচার চাওয়ার জন্য অন্যায় ছিলেন না, কিন্তু তাদের উচিত ছিল। বিষয়টিতে ধৈর্য ধরুন, কারণ এটি জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে না কিন্তু যদি তা হয়ে থাকে তবে তিনি আশা করেছিলেন যে মহান আল্লাহ এই বিষয়ে তাঁর প্রতি আন্তরিক তাদের ক্ষমা করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 56-66-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মনে হয় যেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেছিলেন যে, আয়েশা, তালহা ও আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ভালো ছিল, কারণ তারা ন্যায়বিচার চাইছিল, কিন্তু সে পদ্ধতিটি ভুল ছিল কারণ তিনি ছিলেন। খুনিদের মোকাবেলা করার জন্য একটি অননুমোদিত সেনাবাহিনী সংগঠিত করার পরিবর্তে কর্তৃত্ব এবং বিচার চাওয়া তার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা চেইন অফ কমান্ড এবং কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, যা সঠিক পদ্ধতি। যদি প্রত্যেকে যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই ন্যায়বিচার কার্যকর করার চেষ্টা করে, যেমন সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে এটি কেবল সমাজে আরও বিদ্রোহ এবং অনৈক্যের দিকে নিয়ে যাবে। সমস্যা সৃষ্টিকারীরা এটিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আরও সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য যেগুলি ইতিমধ্যেই অস্থির ছিল, এমন জায়গাগুলিতে যেখানে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধের জন্য শুধুমাত্র একটি চাপের প্রয়োজন ছিল। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উসমানের হত্যার কারণে সৃষ্ট অশান্তি মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যা তার হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার আগে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহরকে প্রভাবিত করেছিল। একটি অস্থির সাম্রাজ্যের সাথে মোকাবিলা করা কার্ডের ঘরের সাথে ডিল করা পছন্দ করা হয়, সামান্যতম ব্যাঘাত

এটির সমস্ত পতন ঘটাতে পারে। এটি এমন কিছু যা আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, বুঝতে পেরেছিলেন।

মিলন

উভয় পক্ষ মিলিত হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ, আলী ইবনে আবু তালিবের বাহিনী, এবং আয়েশা বিনতে আবু বক্কর, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং আয জুবায়ের ইবনে আওয়ামের সেনাবাহিনী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। , এবং অনুগামীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন, উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তাদের যেকোনো ধরনের সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখা যায় কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল যে এটি একটি যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয় পক্ষকে যুদ্ধ না করার আহ্বান জানান এবং মহান আল্লাহর কাছে শপথ নেন যে, পরিণতির ভয়ে তিনি কখনোই উভয় পক্ষের কাউকে একটি তীর ছুড়তে চান না। কাব ইবনে সূর, আল্লাহ তার উপর রহম করুন, উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঠেকানোর জন্য এতটাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের অস্ত্র রাখার আহ্বান জানাতে গিয়ে নিহত হন।

কোন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে, আলী (রাঃ) আল-কাকা ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন, যাতে আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে পুনর্মিলন করতে উৎসাহিত করেন। তার সাথে এবং তাকে উসমানের হত্যাকারীদের সাথে মোকাবিলা করার অনুমতি দিন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন। আল কাকা, আল্লাহ তার উপর রহম করুন, তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের নেতাদের অনেক অজ্ঞ অনুসারী ছিল যারা তাদের পক্ষে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল, এই পর্যায়ে এই নেতাদের আক্রমণ করা কেবল আরও রক্তপাত এবং অনৈক্যের দিকে নিয়ে যাবে। এটা বিদ্রোহীদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আরেকটি অজুহাত দেবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই কারণেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর

খুনিদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড দেননি। তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন যতক্ষণ না তিনি বিভিন্ন ইসলামিক শহরের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং ঐক্য আবার প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর পবিত্র কুরআন অনুযায়ী খুনিদের সাথে মোকাবেলা করবেন, অর্থ, আইনি প্রতিশোধ। তিনি তাদেরকে আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য করতে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করার আহ্বান জানান যাতে এটি মুসলিম জাতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। অথচ, তার বিরোধিতা করলে অস্থিরতা এবং আরও অশান্তি সৃষ্টি হবে। এটি শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের এবং ইসলামী জাতির মধ্যে আরও সমস্যা সৃষ্টির জন্য তাদের মন্দ পরিকল্পনাকে ইন্ধন জোগাবে। আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরামর্শের সাথে একমত হন এবং ঘোষণা করেন যে যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে একই বিষয় নিয়ে আসেন তবে তারা তাঁর সাথে পুনর্মিলন করবেন।

এর পর আলী, আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়েরের সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তারা সকলেই একটি শান্তি চুক্তি করার এবং আলীকে উসমানের হত্যাকারীদের সাথে মোকাবিলা করার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে কথা বলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 66-69-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 114 শ্লোকের সাথে সংযুক্ত:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের মধ্যে কোন ভাল নেই, শুধুমাত্র যারা নির্দেশ দেয়... মানুষের মধ্যে সমঝোতার জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

ধ্বংসাত্মক মানসিকতার অধিকারী করার পরিবর্তে ইতিবাচক উপায়ে একত্রিত করে যা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। যদি একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসার উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তারা ন্যূনতম যা করতে পারে তা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে এটি একটি ভাল কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি সহীহ বুখারী, 2518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলমানের মধ্যে মিলন স্বেচ্ছায় নামায ও রোযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল এই ধার্মিক মনোভাবের ফল যেমন স্কুল, হাসপাতাল ও মসজিদ নির্মাণ।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমান তখনই এই আয়াতে উল্লিখিত মহান পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করবে। প্রতিটি ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নয় তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অকৃত্রিম মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উটের যুদ্ধ

মন্দ পরিকল্পনা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা, তালহা ও আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে শান্তি চুক্তি করার পর তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি পরের দিন বসরা থেকে রওয়ানা হবেন এবং আদেশ দেন যে, কেউ যেন না থাকে। উসমানকে অবরোধ ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার সাথে থাকা উচিত। এই ঝামেলাকারীদের অনেকেই আলীর বাহিনীতে যোগ দেয় এবং কেউ কেউ আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়েরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নিজেদের জন্য কিছু সুরক্ষা লাভ করা। এই সমস্যা সৃষ্টিকারী এবং বিদ্রোহীরা তাদের নিয়ে গঠিত যারা অন্যদের দ্বারা সমস্যা সৃষ্টিকারী হিসাবে পরিচিত ছিল না, যারা পরিচিত ছিল কিন্তু তাদের গোত্র থেকে সুরক্ষা পেয়েছিল, যাদের উসমান (রাঃ)-এর হত্যায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে কোন প্রমাণ ছিল না, এবং যারা মুনাফিক ছিল কিন্তু তাদের ভণ্ডামি স্পষ্টভাবে দেখায়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল যে দুটি গ্রুপের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি তাদের এবং তাদের মন্দ পথের অবসানের ইঙ্গিত দেবে। তাই তারা পরের দিনের প্রথম দিকে যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে যদি একটি লড়াই শুরু হয়, তবে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিতে উভয় পক্ষই বিশ্বাস করবে যে অপর পক্ষ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এটি আরও

লড়াই, রক্তপাত এবং অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করবে। এটা অন্তত কিছু সময়ের জন্য মুসলমানদের তাদের থেকে বিভ্রান্ত করবে।

যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন আলী, তালহা এবং আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। পরিবর্তে, তারা লড়াই শেষ করার এবং যতটা সম্ভব তাদের নিজেদের পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রতিটি নেতা তাদের সৈন্যদের শুধুমাত্র নিজেদের রক্ষা করার জন্য এবং অন্য পক্ষের উপর আক্রমণ না করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কেউ কল্পনা করতে পারেন যে দুটি বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে এটি কতটা কঠিন হবে যখন কমান্ডার এবং তাদের সৈন্যদের মধ্যে যোগাযোগের যন্ত্র ছিল না।

তার সৈন্যদের রক্ষা করার এবং আরও যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করার পর, আয জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করেন এই আশায় যে তার সৈন্যরাও তাকে তা করতে দেখে পিছু হটবে, যার ফলে যুদ্ধ শেষ হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের নিয়ে এসে পরিস্থিতি ঠিক করার পরিকল্পনাটি একটি বিপজ্জনক মোড় নিয়েছে এবং তিনি নিরীহ মুসলমানদের রক্তপাত করতে চাননি। এমন খবর রয়েছে যে যখন তাকে তার প্রথম চাচাতো ভাই আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, তখন তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন। এছাড়াও, তিনি সহীহ মুসলিম, 7322 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একটি দলের দ্বারা হত্যা করা হবে। ভুল ছিল যেহেতু আয জুবায়ের জানতে পেরেছিলেন যে আম্মার, আলীর সেনাবাহিনীতে রয়েছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি আরও উৎসাহিত হয়েছিলেন পিছু হটতে এবং যুদ্ধে অংশ না নিতে। পরে কিছু বিদ্রোহী তাকে ধাওয়া করে এবং শহীদ হন। যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে

তাকে হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ পাওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 127-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তালহা, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর পায়ে একটি বিপথগামী তীর আঘাত হানে যখন তিনি সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার শরীর সহ রক্ষা করার সময় তীরটি উহুদে সে যে পুরানো ক্ষত পেয়েছিল তা আবার খুলে দিল। ফলস্বরূপ, তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান।

আলি, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনি যখন অনেক মুসলমানকে হত্যা করা দেখেছিলেন তখন তিনি এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র হাসান বিন আলীকে বলেছিলেন যে তিনি চান যে তিনি বহু বছর আগে মারা যেতেন এবং কখনও এমন সাক্ষ্য দেননি। একটি ভয়ঙ্কর দিন।

আয়েশা, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার উটের উপর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন, এই আশায় যে সেখানে তার উপস্থিতি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করবে, কারণ একজন সত্যিকারের মুসলমান তার ক্ষতি করার ভয় পাবে। কিন্তু দুষ্ট বিদ্রোহীরা এতে নিরস্ত হয় নি এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে, যদিও তাদের থামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আয়েশাকে টার্গেট করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, জেনেছিলেন যে তার হত্যার ফলে ইসলামী জাতির মধ্যে একটি আগুন জ্বলবে যা সম্ভবত কখনই নির্বাপিত হবে না। কিন্তু তার অনুগামীরা তাকে রক্ষা করার জন্য সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিল।

আলী, বুঝতে পেরেছিলেন যে যতক্ষণ আয়েশা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে এবং তিনি সত্যিকারের বিপদে থাকায় তিনি তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার হাওদা, যেটিতে সে বসে ছিল, তাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনা হয়েছিল এবং তিনি তাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন, তখন তার অনুসারীরাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে, যার ফলে যুদ্ধ শেষ হয়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি একজন আহত সৈনিককে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না, যারা পালিয়েছে তাদের তাড়া না করতে এবং তাদের শিবিরে আনা অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধ লুণ্ঠন না নিতে। তিনি বিরোধী সেনাবাহিনীকে বলেছিলেন যে যদি তারা তার কোনো লোকের কাছে তাদের সম্পত্তি খুঁজে পায় তবে তারা তা ফিরিয়ে নিতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 70-84-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্রোহীরা আরেকটি অশুভ পরিকল্পনা করে। কিন্তু একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে মন্দ পরিকল্পনা শুধুমাত্র পরিকল্পনাকারীকে প্রভাবিত করে, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই

পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

"এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

ভাই

উটের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয় পক্ষের নিহত সকল মুসলমানদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি এবং যারা তার থেকে ভিন্ন তারা তাদের থেকে হবেন যারা মহান আল্লাহ, অধ্যায় 15 আল হিজর, 47 নং আয়াতে বলেছেন:

"এবং তাদের বুকের মধ্যে যা কিছু অসন্তোষ আছে আমরা তা দূর করে দেব, [তাই তারা হবে] ভাই ভাই, সিংহাসনে একে অপরের মুখোমুখি।"

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 87-88-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির যৌবনকালে দায়িত্বের অভাব এবং একটি সাধারণ দৈনিক সময়সূচী ভাগ করে নেওয়ার কারণে, যেমন একই স্কুলে পড়া, লোকেরা অন্যদের সাথে দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি করে, যেমন ভাইবোন বা বন্ধু। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব বৃদ্ধি ও তারতম্যের সাথে সাথে তাদের দৈনন্দিন সময়সূচীর পরিবর্তনের কারণে মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি তাদের মধ্যে বন্ধনকে দুর্বল করে দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা একে অপরের থেকে বেশ দূরে হয়ে যায়।

এটি প্রায়শই যেসব বাড়িতে অনেক ভাইবোন বা বন্ধুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জীবনের নিজস্ব পথ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্যদের থেকে আলাদা। এটা তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। কোটি কোটি মানুষ এখনো, কোন দুটি পথ এক নয়। মানুষ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ এই পথের পার্থক্য। বেস্ট ফ্রেন্ড শুধু নামেই বন্ধু হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠ ভাইবোন একে অপরের থেকে আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়। এটি নিয়তির একটি অংশ এবং সত্যিই অনিবার্য। এই বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছু লোক এর কারণে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারে। তারা তাদের জীবনের পরিবর্তনগুলি অপছন্দ করে যা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তাদের জীবনে এই পরিবর্তনগুলি এমন কিছু যা আল্লাহ, মহান, পছন্দ করেছেন তাই তাদের অপছন্দ করা মহান আল্লাহর পছন্দকে অপছন্দ করা। একজন মুসলমানের উচিত বিষয়গুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা। অর্থ, তাদের আশা করা উচিত যে একদিন পরকালে তারা যে দৃঢ় সহভাগিতা ভাগ করে নিয়েছিল তা আবার জাল হবে কিন্তু অনেক উচ্চতর এবং অলঙঘনীয় স্তরে। এই আশা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর প্রতি আরও বেশি আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে যে এই পরিণতি কেবল তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরই দেওয়া হবে। উপরন্তু, এটি একজন মুসলমানকে তাদের সঙ্গীর জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একটি সৎ কাজ। তারা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসের উপর আমল করার জন্যও পুরস্কৃত হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে ভালোবাসে। অন্যদের জন্য যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। সুতরাং এই মানসিকতা অবলম্বন করা একজন মুসলমানকে অকৃতজ্ঞতা এড়াতে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করতে এবং আরও বেশি পুরষ্কার অর্জন করতে সাহায্য করবে এই আশায় যে তারা আবার তাদের সঙ্গীর সাথে ভাগ করে

নেওয়া একটি শক্তিশালী বন্ধনে আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 47:

"এবং তাদের বুকের মধ্যে যা কিছু অসন্তোষ আছে আমরা তা দূর করে দেব, [তাই তারা হবে] ভাই ভাই, সিংহাসনে একে অপরের মুখোমুখি।"

ভদ্রতা

উটের যুদ্ধের পর, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের সাথে খুব সদয়ভাবে কথা বলেছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করার তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কখনও তা ধরেননি। ফলে তারা তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করল এবং তার আনুগত্য করার শপথ করল। তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর দুই পুত্র, মূসা ও ইমরান (আঃ)-এর প্রতি অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তারা তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পরে, অন্যান্য সৈন্যরাও তাই করেছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 88-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, কারো সাথে যুদ্ধ বা প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য কামনা করেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

লেটিং থিংস গো

কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা একে অপরের সাথে মতানৈক্য করেননি কখনও একে অপরের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করেন, কারণ তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার সাথে যা করেছেন, পার্থিব লাভ বা লাভের জন্য নয়। অন্য ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার দু'জন লোককে বেত্রাঘাত করেছিলেন কারণ তারা আয়েশাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আম্মার ইবনে ইয়াসির, যিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে ছিলেন, উটের যুদ্ধে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনা করেছিলেন তাদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 93-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আয়েশাকেও প্রদান করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিধান দিয়ে এবং তাকে একটি সম্মানজনক বিদায় দিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে তিনি লোকদের বলেছিলেন যে তারা কেবল বিশ্বাস করে (উসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে) আরও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এবং উটের যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাগুলিকে অন্যের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের কারণ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, তাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি আলীকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সেরাদের একজন হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। উত্তরে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তিনি তার কাজের প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং অন্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 109-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসেন তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর কুফায় হিজরত

খিলাফত স্থানান্তর করা

উটের যুদ্ধের পর, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাওয়ার সংকল্প অব্যাহত রাখেন। তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সমস্যাগুলির উত্সের কাছাকাছি হতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং সরাসরি এটি মোকাবেলা করতে পারেন। তাঁর আগমনে তিনি লোকদেরকে ভাল কাজ করার আহ্বান জানান এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 148-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) এর মধ্যে মতবিরোধ

সিফিনের যুদ্ধ

আরও সমস্যা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শার্ট যা তিনি শহীদ হওয়ার সময় পরেছিলেন তা সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছেছিল এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা। রাগান্বিত হয়ে তার খুনিদের কাছে বিচার চাওয়ার ব্যাপারে অনড় হয়ে পড়েন। তারা আয়েশা, তালহা এবং আয জুবায়ের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে একই মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, যেমন তারা সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছু সংশোধন করা হবে না। অবিলম্বে তারা আলী ইবনে আবু তালিবের প্রতি আনুগত্যের শপথ স্থগিত রেখেছিল, যতক্ষণ না তাদের দাবি পূরণ হয়। আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, প্রথমে ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিদ্রোহের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারা বসতি স্থাপন করার পরে, তিনি উসমানের হত্যাকারীদের সাথে মোকাবিলা করবেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে অবিলম্বে তাদের সাথে মোকাবিলা করা কেবলমাত্র দেশে বিদ্রোহ ও অশান্তিকে আরও প্রজ্বলিত করবে। মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আশঙ্কা করেছিলেন যে এই পরিকল্পনা

বিদ্রোহীদের শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে।

যেহেতু মুয়াবিয়া উসমানের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে অবিলম্বে আইনি প্রতিশোধ নেওয়া তার অধিকার ছিল। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 33:

" এবং সেই আত্মা [অর্থাৎ ব্যক্তিকে] হত্যা করো না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, অধিকার ছাড়া। আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দিয়েছি, কিন্তু সে যেন প্রাণহানির ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। প্রকৃতপক্ষে, তাকে [আইন দ্বারা] সমর্থন করা হয়েছে।"

আলী এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের ব্যাপারে তাদের মতবিরোধের ভিত্তিতে। মুয়াবিয়া, উসমানের একজন আত্মীয় ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এবং তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার ব্যক্তিগতভাবে খুনিদের প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন যেহেতু তিনি খলিফা ছিলেন এবং তাই সরাসরি তার পথে খুনিদের সাথে মোকাবিলা করবেন। তাদের মতবিরোধের সাথে সম্পদ এবং কর্তৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ এটি তাদের অতীত কর্ম এবং আন্তরিকতার সাথে স্পষ্টতই বিরোধিতা করে। তাদের আন্তরিকতা এবং অতীত কর্ম সরাসরি আল্লাহ, মহান, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। যেহেতু তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ছিল, তাই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে তারা পার্থিব জিনিসের জন্য যুদ্ধ

করেছে। বরং, কাউকে তার অতীত আচরণ এবং প্রামাণিক প্রমাণ দ্বারা কারো গোপন উদ্দেশ্য বিচার করতে হবে, যা তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে হতে পারে। যদি কেউ তাদের অতীত আচরণ এবং তাদের চরিত্র সম্পর্কিত প্রমাণ, পবিত্র কুরআন থেকে সরাসরি নেওয়া প্রমাণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খাঁটি রেওয়ায়েতগুলিকে মূল্যায়ন করে তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে একজন বিবেকবান ব্যক্তি কেবল তাদের মতবিরোধের ব্যাখ্যা করতে পারেন। সর্বোত্তম উপায়, অর্থ, তাদের মতবিরোধ ছিল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতার ভিত্তিতে, পার্থিব লাভের জন্য নয়।

উপরন্তু, আলি, শুধুমাত্র মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট হন, সমঝোতার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে এবং তিনি মুয়াবিয়ার জন্য মনস্থ করেছিলেন, আল্লাহ তার উপর, মহান আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করতে। এবং খলিফার কথা শুনবে ও মান্য করবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রে ঐক্য আনবে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 9-10:

“এবং যদি মুমিনদের মধ্যে দুটি দল মারামারি করে, তবে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একজন অন্যের উপর অত্যাচার করে, তবে যে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়পরায়ণতা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। মুমিনরা তো ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।"

এ মামলায় লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা যদি এই নির্দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের ঘরে অবস্থান করে এবং সত্যের দোহাই দিয়ে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে কোনো আইনি শাস্তি কার্যকর হবে না এবং মিথ্যার মুখোমুখি হবে না। তখন মুনাফিক ও জালেমরা সকল পবিত্র সীমা লঙ্ঘন করা, মুসলমানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, তাদের লোকদের বন্দী করা এবং তাদের রক্তপাত করা সহজ মনে করবে, কারণ তারা তাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হবে এবং মুসলমানরা এই বলে তাদের মোকাবিলা করা থেকে বিরত থাকবে যে তারা। অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ । তাই আয়াতে উল্লেখিত মামলায় লড়াই আবশ্যক।

উপরন্তু, উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে যে আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, খলিফা হওয়ার যোগ্য এবং মুয়াবিয়া, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, এটি কখনও চ্যালেঞ্জ করেননি। শ্রেষ্ঠত্ব, জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞান, ধর্মীয় অঙ্গীকার, সাহস এবং আলীর গুণাবলী মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সুপরিচিত এবং স্বীকৃত ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে তাদের কারোরই মতভেদ ছিল না। তারা কেবল এটি কীভাবে অর্জন করবে তা নিয়ে ভিন্ন ছিল। আলী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, যথাযথভাবে বিশ্বাস করতেন যে উসমানের হত্যাকারীদের কাছ থেকে আইনগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, ইসলামী রাষ্ট্রের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ বিদ্রোহ ও অশান্তি ইসলাম জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। উসমান (রাঃ)-এর হত্যার পরের অবস্থা। আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি অবিলম্বে প্রতিশোধ নেওয়া হয়, তবে এটি বাকি বিদ্রোহীদেরকে আরও বিদ্রোহ করার জন্য আরেকটি অজুহাত দেবে কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের ভাল আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার জন্য চুপ করা হয়েছে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে অজ্ঞদের মধ্যে আরও বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হতো। প্রথমে ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরকে স্থিতিশীল করার পদক্ষেপ নিলে এবং তারপর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে সমাজের অভ্যন্তরে আরও

অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা যেত। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং অবিলম্বে খুনিদের শাস্তি পেতে চান এবং ফলস্বরূপ তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার রাখেন, যতক্ষণ না তাঁর দাবি পূরণ হয়। এর ফলে উভয়ের মধ্যে মারামারি হয়।

এই মতানৈক্য থেকে তিনটি দল আবির্ভূত হয়েছিল, যাদের সকলেই নিম্নলিখিত আয়াতগুলির উপর ভিত্তি করে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 9-10:

"এবং যদি মুমিনদের মধ্যে দুটি দল মারামারি করে, তবে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একজন অন্যের উপর অত্যাচার করে, তবে যে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়পরায়ণতা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতাকারীদের ভালবাসেন। মুমিনরা তো ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।"

একটি দল বিশ্বাস করেছিল যে খলিফা আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে শোনার এবং মেনে চলার যোগ্য এবং তাই তাঁর সাথে যোগদান করেছিলেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

অন্যরা বিশ্বাস করেছিল যে মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সঠিক ছিলেন এবং তাই তাঁর সাথে যোগ দেন। তৃতীয় দলটি কে বেশি সঠিক তা নিয়ে অনিশ্চিত ছিল এবং তাই তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে যতক্ষণ তারা অনিশ্চিত ছিল ততক্ষণ তারা কোনও পক্ষের সাথে লড়াই করতে পারবে না এবং তাই তারা জড়িত হওয়া থেকে বিরত ছিল। প্রতিটি দল সাহাবীদের নিয়ে গঠিত, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আন্তরিক মুসলমান।

পরিশেষে, যেহেতু তারা উভয়েই উচ্চ স্তরের ইসলামী জ্ঞান এবং মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তারা উভয়েই স্বাধীন যুক্তির স্তরে ছিলেন। এটি একজনকে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন বের করার জন্য তাদের পেশাদার নিরপেক্ষ বিচারের সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে। এই অনুসারে আলী এবং মুয়াবিয়া উভয়েই, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহ তাদের ভিন্ন মতের জন্য পুরস্কৃত হবেন।

আলী, মুয়াবিয়ার কাছে একটি দূত এবং একটি চিঠি পাঠান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে উটের যুদ্ধের কথা জানিয়ে এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে সমস্ত সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বসম্মতভাবে তাকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন এবং তিনি তাই আনুগত্যের অঙ্গীকার করা উচিত এবং তাকে উসমান

(রা) এর হত্যাকারীদের সাথে তার নিজস্ব উপায়ে মোকাবেলা করার অনুমতি দেওয়া উচিত। কিন্তু সিরিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করার পর, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জোর দিয়েছিলেন যে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার পরেই তিনি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবেন।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন যেগুলি হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সংশোধন করার আশায়।

উভয় পক্ষ যখন সিফিনে পৌঁছায়, তখন দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়, কারণ উভয় পক্ষই সর্বাত্মক লড়াইয়ে অংশ নিতে চায়নি, কারণ এতে অনেক মুসলিম প্রাণহানি ঘটত।

অনেক সাহাবী, যেমন আবু দারদা এবং আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করতে এসেছিলেন কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাই তারা প্রত্যাহার করে নেয় এবং কোন যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

তারা উভয় পক্ষ থেকে সমঝোতার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোন পক্ষই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি।

যুদ্ধের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছিলেন যে যে কোনো মুসলিম সৈন্য যে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করেছিল যে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে এবং নিহত হয়েছে, সে যে পক্ষই থাকুক না কেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে ইয়াসির, যিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, তিনি তাঁর পক্ষের একজন সৈনিককে সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে কাফের হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাকে সংশোধন করে বললেন যে সিরিয়ার সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করেছে এবং এই সীমালঙঘনের কারণে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করছে। তাদের মাবুদ ছিলেন এক, তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এক এবং তাদের প্রার্থনার দিকনির্দেশনা ছিল এক। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন। সহীহ মুসলিম, 7322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি ভ্রান্ত দল দ্বারা হত্যা করা হবে। তার শাহাদাত ছিল একটি প্রধান কারণ যা মুয়াবিয়ার পক্ষকে আলীর সাথে পুনর্মিলন করতে উৎসাহিত করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 19-22, 36-37 এবং 142-159 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির আহ্বান

সিফিনের যুদ্ধ কিছু সময়ের জন্য চলে এবং সেনাবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

যখন আশআত ইবনে কায়স, যিনি আলী ইবনে আবু তালিবের একজন সেনাপতি ছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি অনেক মুসলিম মৃত্যুর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তখন তিনি তার সৈন্যদের বলেছিলেন যে যদি তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায় তবে তারা সকলেই নিহত হবে এবং কেউ হবে না। ইসলামী সাম্রাজ্য, নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। তাঁর কথার খবর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছে এবং তিনি তাঁর সাথে একমত হন এবং যোগ করেন যে রোমান ও পারস্যরা এই সুযোগটি গ্রহণ করবে এবং সিরিয়া ও ইরাকে আক্রমণ করবে। প্রকৃতপক্ষে, রোমান রাজা এই সুযোগটি গ্রহণ করে এবং এটি দখলের আশায় ইসলামী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চিঠি লিখলেন। তিনি তাকে তার ভূমিতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান অন্যথায় তিনি আলী (রা.)-এর সাথে মিটমাট করবেন এবং তারা উভয়ে মিলে তাকে আক্রমণ করবে। এই হুমকি পেয়ে রোমান রাজা প্রত্যাহার করে নেন।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সৈন্যদেরকে তাদের বর্শার শেষাংশে পবিত্র কুরআন বেঁধে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে বিষয়টি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন যাতে উভয়ের মধ্যে একটি ফয়সালা হয়। সেনাবাহিনী তৈরি করা যেতে পারে। আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে একমত হন এবং মন্তব্য করেন যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিচারের জন্য মহান আল্লাহর কিতাবের কাছে আসতে

অস্বীকার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে, যখন পবিত্র কুরআন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনা হয়েছিল, এবং নিম্নলিখিত আয়াতটি তাঁর কাছে পাঠ করা হয়েছিল, তখন তিনি সাড়া দিয়েছিলেন যে তিনিই প্রথম পবিত্র কুরআন জমা দেবেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 23:

"আপনি কি তাদের কিতাবের একটি অংশ বিবেচনা করেন না? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে এটি তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবে। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকার করে।"

আলির বিরুদ্ধে এটি কোনোভাবে একটি কৌশল ছিল বলে পরামর্শ দেওয়া যাতে মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, পরাজয় এড়াতে পারেন এবং পরবর্তী তারিখে তার বিরুদ্ধে পুনরায় সংগঠিত হতে পারেন, এটি একটি নির্লজ্জ অপবাদ। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কাপুরুষ ছিলেন না এবং তিনি যেটিকে সঠিক পথ বলে মনে করতেন তার জন্য মৃত্যুবরণ করতেন। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন ব্যবহার করে কাউকে ধোঁকা দেওয়া তার এবং অন্য কোন সাহাবীর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আচরণ এবং চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা ছিল ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের মনোভাব, সাহাবীদের নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যুদ্ধ চলতে থাকলে ইসলামী জাতির পতনের আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। এমনকি তিনি আলীকে লিখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন যে, তাদের কেউই যুদ্ধ এত তীব্র পর্যায়ে পৌঁছানোর আশা করেননি, অন্যথায় তারা কখনই প্রথম স্থানে লড়াই করত না। তিনি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে যা ছিল তা সংশোধন করতে খুব বেশি দেরি হয়নি। সমস্যা সৃষ্টিকারীরাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল কারণ তারা ইসলামী জাতির পতন কামনা করেছিল কিন্তু এই মিলনের মাধ্যমে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ভেস্তে

যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 160-174 এবং 178-179 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নোবেল আচার-আচরণ মেনে চলা

এমনকি সিফীনের যুদ্ধের সময়ও উভয় পক্ষই ভালো আচরণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা জমিতে জলের উত্স থেকে একে অপরকে বঞ্চিত করবে না। নামাজ পড়ার জন্য তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে, উভয় পক্ষের সৈন্যরা তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে কথা বলার জন্য বিরোধীদের শিবিরে প্রবেশ করত। তারা নিহত মুসলমানদের সম্মান করত এবং তাদের জন্য জানাজা নামাজের ব্যবস্থা করত, যদিও তারা বিপরীত শিবিরের সৈন্য হয়। বন্দীদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা হতো। বন্দীরা যুদ্ধ বন্ধ করার শপথ নিলে তাদের সমস্ত সরঞ্জামসহ মুক্তি দেওয়া হয়। তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে অস্বীকার করলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখা হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 173-176-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত করে যে তারা যুদ্ধ করছিল না পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল। বরং, তারা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করছিল, বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক ছিল। এই কারণেই তারা বিপরীত শিবির থেকে সৈন্যদের অধিকার লঙ্ঘন করেনি। যদি তারা পার্থিব কারণে যুদ্ধ করত, তবে তারা অবশ্যই একে অপরের সাথে এত ভাল আচরণ করত না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মহৎ চরিত্র গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে সদয় আচরণ করতে চায় তাকেও অন্যদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে অন্যথায় তারা সফল হবে না কারণ একমাত্র প্রকৃত সফল ব্যক্তিরাই বিশ্বাসী।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের সম্পদকে তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র

দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

সন্দেহজনক এবং বেআইনী

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে এবং যুদ্ধ এড়াতে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। যারা উট এবং সিফীনের যুদ্ধের সময় পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন, তাদের সমালোচনা করা যাবে না এবং কোন সাহাবী দ্বারা তাদের সমালোচনা করা হয়নি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা এই বিষয়ে পক্ষ নিয়েছিলেন। যারা পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত ছিল তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করছিল, যিনি স্পষ্ট করেছেন যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা সর্বদা উত্তম। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, কাকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাই তারা সঠিক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর তাদের মতামতের বিচার করার জন্য পক্ষ নিয়েছিলেন এবং তাই তারা সকলেই দোষমুক্ত। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, যখন কোন আলেম একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হয়। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং বেশিরভাগ হারাম জিনিস, যেমন মদ পান করা সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে তাই তাদের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলমানের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

উপরন্তু, যখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কেন জড়িত হননি, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, মহান আল্লাহ। , বেনামী বান্দাকে ভালবাসে। এই ঘটনাটি সহীহ মুসলিমের ৭৪৩২ নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

বেনামী হওয়ার অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি অর্জনের জন্য জাগতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। যেহেতু এটি প্রদর্শনের মতো অনেক পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র একজনের পুরস্কারকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা বিখ্যাত হয়ে যায় তবে তাদের উচিত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন না করে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

বিচার দিবসের প্রস্তুতি

সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি মুসলিম কবরস্থান অতিক্রম করে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য দোয়া করেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে সুসংবাদ তার জন্য যে কিয়ামতকে স্মরণ করে, হিসাবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে এবং এই পৃথিবীতে তাদের সামান্য কিছুতে সন্তুষ্ট থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 180-181-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে গাফিলতি করে জীবনযাপন করে , সে দুনিয়াতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরা ও সাড়া দেওয়া বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। . একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয় তবে এটি বোধগম্য হয় যে কেউ গাফিলতিতে বাস করার পরিবর্তে এখনই, আজকে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে। যদি কেউ গাফিলতি করে শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায় তবে কোনো কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

একটি ফাউল বৈশিষ্ট্য

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যে কেউ মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে অভিশাপ দেয় এবং তার পক্ষে যুদ্ধকারী মুসলমানদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাদের পরিবর্তে উভয় পক্ষের প্রতি রহমত এবং তাদের মধ্যে বিষয়গুলি পুনর্মিলন করার জন্য মহান আল্লাহর জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করবেন। কিংবা মুয়াবিয়া, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর লোকদেরকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অভিশাপ দেওয়ার অনুমতি দেননি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 182-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিশাপ হল যখন কেউ মহান আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য প্রার্থনা করে, যাকে অন্য কিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কে অভিশপ্ত এবং তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তাই এই বোকা অভ্যাস পরিহার করা উচিত। যে ব্যক্তি এর যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া একটি জঘন্য কাজ এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে, অন্য কারো কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। যেসব মুসলমানদের অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস আছে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা এতটাই অপছন্দ করেন যে, বিচারের দিন তারা সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ শেষ দিবসে বাকি সৃষ্টির কাছে তাদের প্রদর্শন করা অপছন্দ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6610 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবশেষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6652, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়ার তীব্রতা তুলে ধরে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাদের হত্যার শামিল।

এমনকি যদি কেউ অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য হয় তবে তা পরিহার করা এবং তার পরিবর্তে এমন শব্দ উচ্চারণ করা নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ যা মহান আল্লাহকে খুশি করবে, যেমন তাঁর স্মরণ।

শান্তির জন্য প্রচেষ্টা

সিফীনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষই দুই দলের মধ্যে সমঝোতার জন্য একটি বৈঠকে সম্মত হয়। আলী ইবনে আবু তালিব আবু মুসা আল আশআরীকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আমর ইবনে আল আসকে তাদের প্রতিনিধি এবং সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তারা সকলেই পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কীভাবে পুনর্মিলন করতে হবে। উভয় নেতা তাদের দুই প্রতিনিধির দ্বারা সম্মত হওয়া রায় মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। কে খলিফা হবেন তার সাথে এই সালিশের কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে খলিফা হওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষেরই কোনো সমস্যা ছিল না। উসমান ইবনে আফফানের খুনিদের সাথে কিভাবে এবং কখন মোকাবেলা করতে হবে তা হল মীমাংসা করার প্রয়োজন ছিল।

যদিও উভয় পক্ষই ঐক্য কামনা করেছিল, তবে কোনটিই কম নয়, দুই সালিসকারী একটি পরিকল্পনায় একমত হতে পারেনি। উভয় পক্ষই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের সাথে তাদের নিজস্ব উপায়ে মোকাবেলা করতে চেয়েছিল এবং তাই কোন চুক্তি হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 207-209 এবং 273-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই সেই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে যা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যকে উৎসাহিত করে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ

করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত

হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন

না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-

মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

আর এনিগেডস (খারিজি)

নতুন বিদ্রোহীরা

যদিও আন্তরিক মুসলমানরা আলী ইবনে আবু তালিব এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যকার সালিশে সন্তুষ্ট হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সমস্যা সৃষ্টিকারীরা ছিল না, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের আনার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল। উসমান ইবনে আফফানকে হত্যার বিচারের জন্য, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তারপরে তারা আরেকটি স্কিম শুরু করে যার মাধ্যমে তারা অজ্ঞ মুসলমানদেরকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করেছিল যে জাতির বিচার মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং তাই প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। এটি একটি অত্যন্ত বোকামি ছিল কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলি মানুষের ন্যায়বিচার অনুসারে বিচার করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাদের দ্বারা নিযুক্ত অগণিত বিচারক ছিলেন, যারা তাদের বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করতেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন একটি বিবাহিত দম্পতিকে তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য বিজ্ঞ বিচারক নির্বাচন করার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

“ আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী পাঠাও। যদি তারা উভয়েই সমঝোতা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে তা ঘটাবেন..."

যে বিচারক পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিচার করেছেন, তিনি মহান আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী বিচার করেছেন। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা আলী এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার সালিশে জড়িত ছিলেন। বিদ্রোহীরা যে আয়াতগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে তার এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 57:

"... ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর জন্য..."

এই বিদ্রোহীরা এমনকি তাদের চরম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদেরকে কাফের হিসেবে চিহ্নিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বিশ্বাস করত যে যে একজন বড় পাপ করেছে সে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ, তারা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, মুয়াবিয়ার সাথে পুনর্মিলন করার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। বিদ্রোহীদের এই দলটির বিরুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টন করার সময় ধু আল খুওয়াইসিরা নামক একজন মুনাফিক মন্তব্য করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়পরায়ণতা করছেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি ন্যায়বিচার না করেন তাহলে কে করবে? উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই সুস্পষ্ট মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্তব্য করেন যে এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত একটি বিদ্রোহী দলকে নেতৃত্ব দেবে যারা প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে। ইসলামের ঈমান ঠিক যেমন একটি তীরের লক্ষ্য থেকে প্রবেশ করে এবং বের হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 492-493-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এম যে কোন হাদীস যেমন সহীহ বুখারীতে পাওয়া যায়, ৬৯৩৪ নম্বরে এই বিদ্রোহীদের আলোচনা করুন। এই বিদ্রোহীরা ইসলামের চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই হাদিসটিও অন্য অনেকের মতোই ইঙ্গিত করে যে, বিদ্রোহীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক ছিল, কিন্তু যে জিনিসটি তাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছিল তা ছিল তাদের অজ্ঞতা। তারা মূর্খতার সাথে ইবাদতকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও আমলের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছে যা তাদের জঘন্য পাপের দিকে নিয়ে গেছে। প্রকৃত জ্ঞান থাকলে এমনটা হতো না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে জ্ঞান পাপকে প্রতিরোধ করতে পারে, বিশেষ করে অন্যদের প্রতি, যেমন গার্হস্থ্য নির্যাতন। একজন ব্যক্তি তখনই অন্যের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকে যখন তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ভয় পায়, অর্থাত্ উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালার

কাছে জবাবদিহিতা ও শাস্তি পেতে পারেন। কিন্তু নিজের কর্মের পরিণতির ভয়ের ভিত্তি ও মূল হল জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনও তাদের কর্মের পরিণতিকে ভয় পায় না। এটি তাদের অজ্ঞতা তাদের পাপ করতে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে উৎসাহিত করবে।

যদি সমাজ মানুষের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতন এবং অন্যান্য অপরাধের ঘটনাগুলি কমাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র ইবাদত এটি ঘটবে না যেমন এটি বিদ্রোহীদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে এবং বড় দুর্দশা সৃষ্টি করতে বাধা দেয়নি। নিরীহ মানুষের জন্য। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলা করা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহীদেরকে মুসলমানদের মূল অংশে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সাথে বিতর্ক করার অনুমতি দিলেন।

বিদ্রোহীরা আলী (রাঃ) এর সাথে তিনটি সমস্যা বলে দাবি করেছিল। প্রথমটি ছিল যে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি তার এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে সালিশের রায় মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যখন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে বিচার একমাত্র তাঁরই। দ্বিতীয়টি হল তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যেমন আয়েশা, তালহা, আয জুবায়েরের দল এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী, তবুও তিনি (তাদের অস্ত্র ব্যতীত) কোন যুদ্ধ লুঠ নেননি। অথবা তাদের কাছ থেকে বন্দী। যদি তারা কাফের হতো তাহলে তার উচিত ছিল যুদ্ধের মাল ও বন্দী করা। যদি তারা বিশ্বাসী হতো, তাহলে প্রথমেই তার তাদের সাথে যুদ্ধ করা উচিত ছিল না। তাদের তৃতীয় সমস্যাটি ছিল যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিশী দলিল থেকে তাঁর খলিফা এবং মুমিনদের কমান্ডার উপাধি মুছে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে সমস্ত মূর্খতার উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, মহান আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানুষকে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেছিলেন: অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 95:

“ হে ঈমানদারগণ, ইহরাম অবস্থায় খেলাধুলা করো না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে - জরিমানাটি কোরবানির পশুর সমান যা সে হত্যা করেছে, যেমনটি তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা বিচার করা হয়েছে..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

“ আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী পাঠাও। যদি তারা উভয়েই সমঝোতা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে তা ঘটাবেন..."

তাদের দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি তাদের বলেছিলেন যে যতদিন তারা মুসলিম ছিলেন ততদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের মা ছিলেন এবং তাকে বন্দী দাসী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কোন বিবেকবান মানুষ এটা মেনে নেবে না। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 6:

"নবী মুমিনদের নিজেদের চেয়ে বেশি যোগ্য এবং তাঁর স্ত্রীরা তাদের মা..."

তাদের তৃতীয় ইস্যু সম্পর্কে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুসলিমরা এতে আপত্তি করলে এবং তার পরিবর্তে হুদাইবিয়ার চুক্তি থেকে তাঁর মহান আল্লাহর রাসূলের উপাধি মুছে ফেলেন। তিনি তার নাম লিখতে চেয়েছিলেন। তিনি শান্তির স্বার্থে চুক্তিটি সম্পূর্ণ করার জন্য এটি করেছিলেন। যদি তিনি এটি করেন, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিসের দলিল থেকে তাঁর উপাধি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করছেন।

এর ফলে প্রায় দুই হাজার বিদ্রোহী তাদের বিদ্রোহ থেকে অনুতপ্ত হয় কিন্তু বাকিরা তাদের সুস্পষ্ট গোমরাহী ও পার্থিব জিনিস যেমন জমিনে ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব লাভের লোভের উপর অটল থাকে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সেই অধিকার প্রদান করবেন যা কোন মুসলমানের প্রাপ্য যতক্ষণ না তারা ইসলামের আইন ভঙ্গ না করে বা অবিশ্বাসের স্পষ্ট লক্ষণ দেখায় না। তিনি তাদের রক্তপাত না করার জন্য, মানুষকে আতঙ্কিত বা রাস্তায় লুটপাট না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। অন্যথায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। বিদ্রোহীরা তাদের সাথে মতানৈক্যকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে গণ্য করায়, যাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ তারা তাদের জন্য হালাল মনে করেছিল, তারা মুসলমানদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে।

তারা আলীকে অনুরোধ করেছিল, মুয়াবিয়ার সাথে সালিশ না করার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তারা আগে থেকেই এতে সম্মত হয়েছিল। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি তার কথার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাননি এবং সালিশ করা ছিল সঠিক কাজ। এই

বিদ্রোহীরা তারা যে শহরগুলিতে বাস করত তা ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল এবং ইরাকের নাহরাওয়ানে বাহিনীতে যোগ দেয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 260-264 এবং 268-273-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিদ্রোহীরা ছিল একনিষ্ঠ উপাসক কিন্তু অত্যন্ত অজ্ঞ এবং সামান্য ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ছিল। ফলস্বরূপ, তারা সহজেই তাদের দুষ্ট নেতাদের দ্বারা এবং পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের মন্দ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-105:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের (তাদের) কর্মের ব্যাপারে অবহিত করব? তারা এমন লোক যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" তারাই যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবং আমরা কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন [গুরুত্বপূর্ণ] নির্ধারণ করব না।"

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একটি মহান অপবাদ

আলী ইবনে আবু তালিব এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যকার সালিশ, আপোষহীনভাবে শেষ হওয়ার পর, আলী (রা) নাহরাওয়ানে অবস্থানরত বিদ্রোহীদের সিরিয়া অভিযানে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। . তারা তার সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায় যতক্ষণ না তিনি সাক্ষ্য দেন এবং মানুষকে তার এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে বিষয়টির বিচার করার অনুমতি দিয়ে অবিশ্বাসের কাজ থেকে অনুতপ্ত হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 273-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত করা হল যখন কেউ তাদের পিঠের পিছনে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এগুলো বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে মৃত লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র গীবত করা বৈধ হয় যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে এবং রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে সম্পূর্ণরূপে জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্বন্ধে কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণ করা যদি অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে এই বা অনুরূপ শব্দগুলি বললে তাদের আপত্তি না থাকে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত

তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা অন্যের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকবে।

জীবনকে সম্মান করা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহীদের সতর্ক করেছিলেন যে রক্তপাত করবেন না, মানুষকে সন্ত্রাস করবেন না বা রাস্তায় লুটপাট করবেন না অন্যথায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। বিদ্রোহীরা তাদের সাথে মতানৈক্যকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে গণ্য করায়, যাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ তারা তাদের জন্য হালাল মনে করেছিল, তারা মুসলমানদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 273-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 68:

"... অথবা সেই আত্মাকে হত্যা কর যা আল্লাহ [হত্যা করা] হারাম করেছেন, অধিকার ছাড়া..."

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা জীবনের সকল প্রকারকে সম্মান করে। তারা ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6028 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন না। ইসলাম শুধু মানুষের প্রতি সদয় আচরণের পরামর্শই দেয় না, পশুদের জন্যও তা নির্দেশ

করে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম মানব জীবনের উপর এমন মূল্য দেয় না। পবিত্র কুরআন একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকে সমগ্র মানবজাতির হত্যার সাথে তুলনা করেছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32:

" ...একটি আত্মাকে হত্যা করে যদি না একটি আত্মার জন্য বা দেশে দুর্নীতি [সম্পাদিত] হয় - যেন সে মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছে। আর যে একজনকে বাঁচায়- যেন তিনি মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন..."

যারা ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে বলে দাবি করে তাদের নিবৃত্ত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। এই আয়াত প্রমাণ করে যে তাদের আসল মন্দ উদ্দেশ্য হল সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করা যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

অন্যের ক্ষতি না করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না অন্য মানুষ তার ধর্ম নির্বিশেষে নিরাপদ না হয়। তাদের জিহ্বা এবং কর্ম থেকে। এটা যদি শুধুমাত্র অন্যের ক্ষতি করার জন্য হয় তাহলে ইসলাম কিভাবে নিরীহ মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়? প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদীসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের জীবন ও সম্পদ তাদের কর্ম থেকে নিরাপদ না হয়।

যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করেন তাদের জানা উচিত যে তিনি কখনই অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করেননি যদি না তা একজন পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় না হয়। তিনি কখনই একজন মহিলা, বৃদ্ধ বা শিশুর ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনই নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি এবং শুধুমাত্র সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেননি। সহীহ মুসলিমের 6050 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী বলে দাবি করে তাহলে তাদের সব পরিস্থিতিতেই এইভাবে আচরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে তাদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবার এবং জিনিসপত্র। কিন্তু এই সব কিছুরই সীমা আছে। কোনভাবেই একজন মুসলমানের কাছে প্রথমে আঘাত করে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ নেওয়ার অনুমতি নেই। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থ, সম্মান ও করুণার সাথে আচরণ করতে চায়।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ

বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বিদ্রোহীদের সতর্ক করেছিলেন যে রক্তপাত করবেন না, মানুষকে সন্ত্রাস করবেন না বা রাস্তায় লুটপাট করবেন না অন্যথায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। বিদ্রোহীরা তাদের সাথে মতানৈক্যকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে গণ্য করায়, যাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ তারা তাদের জন্য হালাল মনে করেছিল, তারা মুসলমানদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে। এক সময় তারা একজন মহান সাহাবীর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে হত্যা করে, কারণ তিনি তাদের কাজের সাথে একমত ছিলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আইনগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের হত্যাকারীদের তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা অহংকার করে উত্তর দিল যে তারা সবাই তাকে হত্যা করেছে, তখন তিনি তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। নাহরাওয়ানে তাদের অবস্থানে পৌঁছানোর পর, তিনি তাদের কাছে দূত পাঠান যাতে তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি তারা তার কিছু রসূলকেও হত্যা করেছিল, যা সর্বদা প্রতিটি জাতি ও ধর্মের দ্বারা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ব্যানার তুলে বিদ্রোহীদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, যে ব্যানারে আসবে সে নিরাপদ থাকবে এবং যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে সে নিরাপদ থাকবে। তাদের মধ্যে অনেকেই পালিয়ে যায় কিন্তু প্রায় 1000 বিদ্রোহী যুদ্ধে অটল থাকে।

এই যুদ্ধের বহু বছর আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই বিদ্রোহীদের একজন নেতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন এবং তাকে মৃতদের মধ্যে পাওয়া যায়।

এমনকি যুদ্ধের পরেও আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করেছিলেন। তিনি তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কেউ পলায়নকারী কাউকে তাড়া করবে না এবং আহত বিদ্রোহীদের কাউকে হত্যা করবে না। তিনি তাদের নারীদেরকেও বন্দী করে নেননি। এমনকি তিনি তাদের সম্পত্তি কুফায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং জনগণকে বলেছিলেন যে তাদের যা অর্থ ছিল তা নিতে, তিনি তার সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের গনীমত ভাগ করেননি। তিনি কেবল তাদের অস্ত্র এবং ঘোড়াগুলিকে ভাগ করেছিলেন, তারা যুদ্ধ করার সময় যে জিনিসগুলি ব্যবহার করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 273-280-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই

অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

দৃঢ় অবস্থান

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বাস করতেন যে তিনি উসমান ইবনে আফফানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য জোর দিয়ে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক কাজটি করছেন। তাই এই খুনিরা যেখানেই লুকিয়ে থাকত তাদের বিরুদ্ধে তিনি মিছিল করতে থাকেন। তিনি মিশরে একটি সৈন্য পাঠান, যেটি হত্যাকারীদের দখলে থাকা প্রধান শহরগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং এটি দখল করে নেয়। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আলী ইবনে আবু তালিব জোর দিয়েছিলেন যে তার অনুসারীরা মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কারণ তিনি নিযুক্ত খলিফার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে ন্যায়বিচার নিজের হাতে নিয়েছিলেন। ঝামেলা সৃষ্টিকারীরা জনগণের মধ্যে অনৈক্য বপন করতে থাকে। যুদ্ধ জনগণকে ভীষণ ক্লান্তি দিয়েছিল এবং তারা যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জোর দিয়েছিলেন যে তাদের খলিফার আনুগত্য করার সময় আইনের বাইরে কাজ করা এবং ন্যায়বিচারকে তাদের হাতে নেওয়ার হাত থেকে ইসলামী জাতিকে রক্ষা করা দরকার। আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অনেক খুতবা দিয়েছিলেন যা জনগণকে তাদের ভূমি রক্ষা করতে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল করার জন্য লড়াই করতে উত্সাহিত করেছিল। আলীর পক্ষের মধ্যে অনৈক্যের কারণে তিনি মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা একমত হয়েছিল যে আলী ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং মুয়াবিয়া সিরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্যদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 605-610-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

সঠিক উপলব্ধি

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার বলা হয়েছিল যে সরকারি কোষাগার স্বর্ণ ও রৌপ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করার পর তিনি কুফাবাসীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কোষাগার খালি না হওয়া পর্যন্ত সব কিছু দিয়ে দিলেন। তিনি প্রায়শই এটি পরিষ্কার করতেন এবং এর ভিতরে প্রার্থনা করতেন, এই আশায় যে এটি বিচারের দিনে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঠান্ডার দিনে একটি সাধারণ পোশাক পরেছিলেন। যখন তাকে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য সরকারী কোষাগার থেকে অংশ নিতে উত্সাহিত করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি সরকারী কোষাগার থেকে কিছুই নেননি এবং তিনি যে চাদরটি পরেছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন যা তিনি মদীনা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 358-360 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এটি শুধুমাত্র মানুষের জন্য তাঁর যে মহান আন্তরিকতা ছিল তা নির্দেশ করে না বরং জড়জগত লাভ ও উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিকেও তাঁর মনোনিবেশ। এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি পেলেই কেউ সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।

জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন৷

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

আবদ্ধ যে বন্ধন

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনগণকে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানাতেন। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে জনগণ অবশ্যই তাদের আত্মীয়দের সম্মান করবে, কারণ তারা তাদের ডানা যার দ্বারা তারা উড়ে। তাদের আত্মীয়দের সমর্থনের সাথে, তারা যা চায় তা অর্জন করতে পারে এবং তারা অসুবিধার সময় সাহায্য করে। একজনের উচিত তাদের বিশিষ্ট আত্মীয়দের সম্মান করা, তাদের অসুস্থ দেখতে যাওয়া, তাদের পরামর্শ নেওয়া এবং যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাকে সাহায্য করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 373-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না। যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য

কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

“…আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

“সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না যে মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অ - মুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা। সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়দের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য

মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্নীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

বিনয়

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সম্পূর্ণ বিনয়ের অধিকারী ছিলেন এবং ফলস্বরূপ এটি তাকে অন্যান্য মহৎ গুণাবলী গ্রহণ করার অনুমতি দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহর কাছে লজ্জিত বোধ করেছেন, তার সাথে এমন কোন অন্যায় করা হয়েছে যা তার ক্ষমা করার ক্ষমতার চেয়ে বেশি ছিল, যে কেউ তার সাথে এমন অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করবে যা তার ধৈর্যের চেয়েও বড়। একজন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন দোষ থাকা উচিত যা তার গোপনীয়তার দ্বারা ঢেকে রাখা যায় না বা এমন কোন প্রয়োজন থাকা উচিত যা তার উদারতা দ্বারা পূরণ করা যায় না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 375-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ

থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। এটি সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা হয় না কারণ এগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং পরিমিতভাবে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

রাতের প্রার্থনা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার তাঁর দিনে রোজা রাখা এবং রাতে ইবাদত করার জোরালো শাসন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন, পরকালের যাত্রা দীর্ঘ এবং রাতের বেলায় ভ্রমণ করে অতিক্রম করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 377-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে

দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

জ্ঞানের বাণী – ১

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার কামিল ইবনে যিয়াদকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষ তিন প্রকার: একনিষ্ঠ আলেম, যে ব্যক্তি নিজেকে বাঁচানোর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং অকার্যকর ব্যক্তি। যারা প্রতিটি আহ্বানকারীকে অনুসরণ করে, প্রতিটি বাতাসের সাথে নমন করে। তারা জ্ঞান দিয়ে পথপ্রদর্শন করে না এবং তারা একটি শক্তিশালী স্তম্ভ এবং সমর্থন ধরে রাখে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 348-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, এই জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত, যা এর সাথে সম্পর্কিত, জ্ঞানী। ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র।

মহান আল্লাহর স্মরণ স্মরণের সকল স্তরকে পরিবেষ্টন করে। যথা, অভ্যন্তরীণ নীরব স্মরণ, যার মধ্যে রয়েছে নিজের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। জিহ্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কার্যত মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

যা কিছু মহান আল্লাহর স্মরণের দিকে নিয়ে যায়, তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, যেমন বস্তুজগতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি ছাড়াই। বা বাড়াবাড়ি। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে এমন কোনো কাজ অন্তর্ভুক্ত যা জাগতিক বা ধর্মীয় বলে মনে হয় যতক্ষণ না এর মধ্যে মহান আল্লাহর আনুগত্য জড়িত থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ছাত্র উভয়ই বাস্তবে একমাত্র ব্যক্তি যারা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করবে কারণ জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অমান্য করে, এমনকি তা উপলব্ধি না করেই, কারণ তারা জানে না যে কোনটি পাপ বা নেক কাজ বলে গণ্য হয়। কিছু ক্ষেত্রে, কেউ এমনও বিশ্বাস করতে পারে যে তারা কঠোরভাবে তাঁর আনুগত্য করছে যদিও তারা এটি থেকে দূরে রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, বাস্তবে বস্তুজগতে আসলে কিছুই অভিশপ্ত নয়। এটা কিভাবে একটি জিনিস ব্যবহার করা হয় যা নির্ধারণ করে যে এটি অভিশপ্ত কিনা। যেমন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা হলে তা উভয় জগতেই এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু যদি এর অপব্যবহার হয় বা মজুত করা হয় তাহলে তা উভয় জগতের মালিকের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটি এই বিশ্বের সমস্ত জিনিসের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রজ্ঞার বাণী – ২

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে জ্ঞান সম্পদের চেয়ে উচ্চতর: জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করে, যেখানে সম্পদ রক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যয়ের সাথে সম্পদ হ্রাস পায়, যেখানে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান হল একটি বিশ্বাস যা অনুসরণ করতে হবে। এটি একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য অনুশীলন করতে সাহায্য করে এবং তাদের মৃত্যুর পরে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যায়, যেখানে সম্পদের সুবিধাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। এবং জ্ঞান শাসন করে, যখন সম্পদের উপর শাসিত হয়। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন বিদ্বানরা থাকবে। তাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাদের শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। ইমাম আবু নাঈম আল আসফাহানীর হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল আসফিয়া, 164 নং বর্ণনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জ্ঞান একজনকে শেখায় কিভাবে তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় তাই নিশ্চিত করে যে তারা উভয় জগতে তাদের থেকে উপকৃত হয়। অথচ, সম্পদ রেখে যাবে এবং তাদের মৃত্যুর সময়, তাদের কবরে এবং বিচার দিবসে কাউকে সাহায্য করবে না।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

জ্ঞানের বাণী – ৩

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বলেছিলেন যে একজন প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদেরকে মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করেন না এবং তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ বোধ করেন না। ইবনুল জাওযীর সিফাতুল সাফওয়াহ 1/170- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যা এই হাদিসটি নির্দেশ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়,

তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার প্রত্যাশা করে। এটা সত্য আশা নয় এটা নিছক ইচ্ছাপূরণ চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায় তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময় একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, যদিও তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্য হয়ে কাটিয়েছে, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় শান্তি ও বরকত।

সঠিকভাবে কমান্ডিং

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আল্লাহ একবার সতর্ক করেছিলেন যে মানুষের জ্ঞান অন্বেষণে কম আগ্রহের একটি কারণ হল তারা লক্ষ্য করে যে কীভাবে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের জ্ঞান থেকে সামান্যই উপকৃত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 356-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে অন্যান্য কারণে যেমন জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং তারা একটি কেন্দ্রীয় আসনের আকাঙ্ক্ষার কারণে একদিকের আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়ে গেল, মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দিলেন এবং এইভাবে তারা এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলমানদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে যদিও বছরের পর বছর ধরে উপদেষ্টার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটি সরল জীবন

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর পূর্বসূরিদের মতো সাধারণ পোশাক পরতেন। তিনি একবার বাজারে ছিলেন যেখানে কিছু ব্যবসায়ী তাকে খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু কিনতে অস্বীকার করেন এবং পরিবর্তে একটি ছেলের কাছ থেকে তিনটি রৌপ্য মুদ্রার জন্য একটি শার্ট কিনেছিলেন যে তাকে চিনতে পারেনি। ছেলেটির বাবা, পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসেন, তাকে আংশিক ফেরত হিসাবে একটি রৌপ্য মুদ্রা অফার করেন, দাবি করেন যে শার্টটির মূল্য মাত্র দুটি রৌপ্য মুদ্রা। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি যা অর্থ দিয়েছেন তাতে তিনি খুশি এবং ছেলেটি যা চার্জ করেছে তাতে খুশি।

আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি যখন খলিফা ছিলেন তখন লোকেরা তাকে পক্ষপাতিত্ব দেখানোর অনুমতি দেননি। উপরন্তু, তার মনোভাব নির্দেশ করে যে তিনি সরল জীবনযাপন করেছিলেন। অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করার জন্য তিনি সরল জীবন যাপন করেছিলেন। একটি সরল জীবন মানুষকে এই জড়জগত উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেন তিনি প্যাচযুক্ত শার্ট পরেছিলেন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি আধ্যাত্মিক হৃদয়ের জন্য আরও নম্র এবং বিশ্বাসীদের অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 361-362-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি

চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

ভাল খরচ

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য ইটের উপরে একটি ইট রাখেননি বা অন্য পাথরের উপর একটি পাথর রাখেননি অর্থ, তিনি নিজের জন্য ঘর নির্মাণ করেননি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 363-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, ভবন নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে পরিচালিত করে কারণ যারা বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরিতে শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি হবে তত কম ধার্মিক কাজগুলি তারা করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন

করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময়কে দখল করে যা তাদের স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজগুলি করতে বাধা দেয়, যেমন উপবাস এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা চরম ক্লান্তি থেকে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কেবল নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

তপস্বীবাদের দিক

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে তপস্বীর তিনটি অংশ ছিল, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 365 এ আলোচনা করা হয়েছে।

তপস্বীর প্রথম দিক হল দীর্ঘ জীবনের আশা না থাকা।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

তপস্যার দ্বিতীয় দিকটি হল একজনকে দেওয়া আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কৃতজ্ঞতার তিনটি দিকই পূরণ করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী হওয়া এড়াতে পারে, কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবে অকৃতজ্ঞ, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যিনি তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"... আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

কৃতজ্ঞতার তিনটি দিক হল অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহকে সকল নেয়ামতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং প্রদানকারী হিসেবে স্বীকার করা। এর একটি দিক হল নিজের নিয়তকে সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। পরবর্তী দিকটি হল জিহ্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা। এবং চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ দিকটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের নির্দেশিত প্রতিটি নেয়ামত ব্যবহার করে নিজের কাজের মাধ্যমে কার্যত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেব। অতঃপর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আমার শাস্তি কঠোর।'

যেহেতু সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা আশীর্বাদের বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় মুসলমানদের ভয় করা উচিত যে অকৃতজ্ঞতা দেখানোর ফলে তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো হয় তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতে পারে অথবা তাদের আশীর্বাদ উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা এবং অভিশাপ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি একজন মুসলিম সত্যিকারের কৃতজ্ঞ হয় তবে তারা এখনও পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হবে কারণ তারা নিশ্চিত। কিন্তু যদি তারা সঠিকভাবে আচরণ করে তবে তারা প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক ও শরীরের শান্তি এবং পরকালে একটি মহান পুরস্কার লাভ করে।

তপস্যার শেষ দিক হল হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং বেশিরভাগ হারাম জিনিস, যেমন মদ পান করা সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে তাই তাদের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন

করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলমানের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

জ্ঞানের বাণী - 4

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার নিম্নলিখিত উপদেশগুলি উপদেশ দিয়েছিলেন, যা ইমাম আল আসফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 157 নম্বরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর আশা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে

ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, তার মধ্যস্থতায় কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি

মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরের জিনিসটি আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি তার পাপ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করবে না।

পাপ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসাবে। সময়ের সাথে সাথে অনেক সংজ্ঞা একটি বড় পাপ ঠিক কি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে. একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ

হল যে কোন পাপ যে শাস্তির জন্য ইসলাম ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোন পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপ উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি বড় গুনাহ। উদাহরণস্বরূপ, গীবত করা একটি বড় পাপ কারণ এটি পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

" ধিক্ প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য।"

কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র সাতটি বড় পাপের কথা বলা হয়েছে সহীহ বুখারীতে ২৭৬৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই সাতটি বড় গুনাহ হলেও এর মানে এই নয় যে তারা মাত্র সাতটি। প্রকৃতপক্ষে , অন্যান্য হাদিস রয়েছে যাতে অন্যান্য বড় গুনাহ যেমন পিতামাতার অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। এই হাদিসটি সহীহ বুখারি, ৬২৭৩ নম্বরে পাওয়া যায়। পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিসে ঘোষিত সাতটি বড় গুনাহ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধকে হত্যা, আর্থিক স্বার্থের লেনদেন, এতিমের সম্পদ হস্তগত করা, যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন করা এবং একজন নিরপরাধ নারীকে অভিযুক্ত করা। ব্যভিচার

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , যখন কেউ ছোটখাট পাপ করে থাকে তখন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বড় হয়ে যায়।

বড় গুনাহ শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মাফ করা হয় যেখানে বড় গুনাহ এড়িয়ে সৎ কাজ করার মাধ্যমে ছোট গুনাহগুলো মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ছোট গুনাহ দূর করে দেব..."

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। উন্নত, এবং মানুষ.

মুসলমানদের নিশ্চিত করতে হবে তারা আকার নির্বিশেষে সব ধরনের পাপ এড়িয়ে চলে কারণ শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল সে মুসলমানদের ছোট পাপকে উপেক্ষা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। সব সময় মনে রাখতে হবে পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

পরের জিনিসটি আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে স্বীকার করতে বিব্রত বোধ করা উচিত নয় যে তারা কিছু জানে না।

কেউ কেউ অদ্ভুত মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মুসলমানদের ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে গণনা করতেন যে এইভাবে আচরণ করেছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে মূর্খ হিসাবে গণ্য করেছিল।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত

করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

এর পরের জিনিসটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ধৈর্য হল ঈমানের প্রতি যেমন মাথা শরীরের প্রতি, এবং যে শরীরে মাথা নেই সেখানে ভালো কিছুই নেই।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলমানের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তান তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলমানকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তৃপ্তি।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি অবস্থাই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয়

তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল বা সন্তুষ্ট আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্তে, সহজ ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলমান কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে আচরণ করা, যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করবে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জেনে তাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান তাদের যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবেন।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি পর্যালোচনা করা, যা ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে দেওয়া পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর

চিন্তা-ভাবনা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের উৎকর্ষ হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন একজন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যার ভয় ছিল, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

বর্ধিত আশীর্বাদ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে দোয়া কৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত এবং কৃতজ্ঞতা আরও আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায়। তারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত, তাই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ আসা বন্ধ হবে না যদি না ব্যক্তির কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বন্ধ হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 383-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা বলতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং

টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 2

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 391-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে যখন সাধারণ জনগণ পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল এবং একনিষ্ঠ আলেম ও রাবীগণ তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেননি। অতএব, জনগণকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো শাস্তি দেওয়ার আগে অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। তিনি উপসংহারে বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা কারো রিযিক পৌঁছাতে বাধা দেয় না এবং মৃত্যুকেও নিকটবর্তী করে না।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

জ্ঞানী পরামর্শ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে তাদের বিষয়ে সর্বদা জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য অনুরোধ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পরামর্শ হল নির্দেশনার সারাংশ। যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে পরামর্শ না করে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে কাজ করে সে মারাত্মক বিপদে পড়ে। অন্য একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পরামর্শ চাওয়া একটি বড় সমর্থন এবং খারাপ প্রস্তুতির একটি দিক হল কারো সাথে পরামর্শ করতে ব্যর্থ হওয়া।

তিনি একবার কাউকে কৃপণের সাথে পরামর্শ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ তারা অন্যদেরকে দারিদ্র্যকে ভয় করার পরামর্শ দেবে এবং অন্যকে উদার হতে নিষেধ করবে। তাদের কাপুরুষের সাথে পরামর্শ করা উচিত নয় কারণ তারা অন্যের সংকল্পকে দুর্বল করে দেবে। তাদের লোভী কারো সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়, কারণ তারা অন্যদেরকে অন্যায় উপায়ে জিনিস সংগ্রহ করতে উত্সাহিত করবে।

তিনি একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন সেরা লোকের সাথে পরামর্শ করতে পারেন তারা হলেন যুক্তি ও জ্ঞানের লোক এবং অভিজ্ঞতা ও সংকল্পের লোক। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 393 এবং 628 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"...সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

আপনার যত্ন অধীনে

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, একবার মিশরে তাঁর গভর্নরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্বের ভূমিকায় লোকদের নিয়োগ করুন, পক্ষপাতিত্ব বা পছন্দের ভিত্তিতে নয়। পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে সরকারী পদে লোক নিয়োগ করা অন্যায় এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার একটি কাজ এবং এতে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। কর্তৃত্বের পদের জন্য, তাকে এমন লোকদের বেছে নেওয়া উচিত যারা ধার্মিক, মর্যাদাবান, জ্ঞানী এবং দয়ালু। তাকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা ধার্মিক পরিবার থেকে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং বিনয়ী লোক ছিল, যারা ধর্মীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কারণ তারা মনোভাবের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভুল থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক। তারা লোভ থেকে অনেক দূরে এবং অন্যদের তুলনায় জিনিসের পরিণতি সম্পর্কে বেশি সচেতন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 393-394-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত

অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

ন্যায়বিচারকে ধরে রাখা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার তার ঢালটি হারিয়েছিলেন এবং এটি একজন ইহুদির দখলে পেয়েছিলেন যিনি দাবি করেছিলেন যে এটি তার। মামলাটি একজন মুসলিম বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষী আনতে বলেছিলেন যে ঢালটি তাঁর ছিল। তিনি যখন সাক্ষী হিসাবে তার ছেলেদের নাম দেন তখন বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, ছেলে হিসাবে এই ধরনের আইনি মামলায় তিনি তার বাবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, মন্তব্য করেছিলেন যে তার ছেলেরা জান্নাতের যুবকদের নেতা ছিল তবুও বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। বিচারক ইহুদির পক্ষে রায় দেন। ইহুদি লোকটি অবাক হয়ে গেল যে, মুসলিম বিচারক কিভাবে মুসলমানদের খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ঢালটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দিলেন। আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ঢালটি ফিরিয়ে নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন কারণ বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে এটি ইহুদি লোকের। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপহার হিসেবে একটি ঘোড়াও দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 395-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে

অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

সমতা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, জনগণকে তাদের সামাজিক মর্যাদা, জাতি, লিঙ্গ বা অন্য কিছু নির্বিশেষে সরকারী কোষাগার থেকে সমান পরিমাণ সম্পদ দান করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 398-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জ্ঞানের প্রকারভেদ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা তিন ধরণের জ্ঞান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 408-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান।

সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জানা মানে শুধু মুখস্থ করা নয়। এটি আসলে তাদের অধ্যয়ন করা এবং একজনের মর্যাদা এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ করার অর্থ। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই একই বৈশিষ্ট্য অন্যদের যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

“নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

যখন সৃষ্টির উল্লেখে ব্যবহার করা হয় করুণাময় মানে কোমল হৃদয় এবং করুণাময়। একইভাবে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সমস্ত ক্ষমাশীল। আর অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

সুতরাং মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী মুসলমানরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে প্রথমে ঐশী গুণাবলী ও নামের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপর তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের চরিত্রে নামের অর্থকে কর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার হল আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার জ্ঞান এবং তিনি যা অপছন্দ করেন তার জ্ঞান।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর

অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

একটি সুন্দর উপদেশ - 3

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 409-410-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে

না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দিয়েছেন, যিনি এই পৃথিবীতে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। তিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন যে তারা মৃত্যুর আগে ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত হন, আনন্দের ধ্বংসকারী, তাদের কাছে পৌঁছায়।

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোধগম্য হয় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য

প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তারা সেখানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন, যিনি তাদের শ্রবণ দিয়েছেন তা বোঝার জন্য তাদের যা বোঝা দরকার।

মহান আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে শ্রবণ করাই একমাত্র উপায় যা সঠিকভাবে এর শিক্ষাগুলো মেনে চলতে পারে। শ্রবণ এবং শোনার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ কেবলমাত্র একজনের মনের সাথে একটি শব্দ স্বীকার করা, এমনকি যদি

তারা আওয়াজ বোঝাতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অনেক দূর থেকে তাদের চিৎকার শুনতে পারে কিন্তু তারা কী বলছে তা বুঝতে সক্ষম হবে না। যদিও, শোনার মধ্যে একটি শব্দ শোনা এবং এটি বোঝার অন্তর্ভুক্ত যাতে একজনের আচরণ পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অন্যকে একটি নির্দিষ্ট মৌখিক নির্দেশ দিচ্ছেন যিনি নির্দেশগুলি শুনে এবং বোঝার পরে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানান।

মুসলমানদের মহান আল্লাহর বাণী শুনতে হবে এবং তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের আচরণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআনের প্রতি এটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে ভালো কিন্তু সঠিকভাবে শুনতে ব্যর্থ হয় যার মধ্যে এর শিক্ষাগুলো বোঝা এবং তার ওপর কাজ করা জড়িত।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বাণী শুনলেই সফলতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তাকে সত্যিকার অর্থে শোনার চেষ্টা করতে হবে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যিনি তাদের চারপাশের জিনিসগুলি দেখার জন্য তাদের দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন।

একজন মুসলমানের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন তখন তাদের কেবলমাত্র প্রার্থনা করা হলেও, তাদের যে কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করা উচিত নয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারাবে। একটি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যু দ্বারা। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন তাদের অজানা তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে ধনী ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তারাও তাদের কবরে কেবল তাদের কৃতকর্ম নিয়েই থাকবে। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা উদাসীন থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন, যিনি তাদেরকে জিনিস বোঝার জন্য হৃদয় ও মন দিয়েছেন।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা

অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মানুষকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

পবিত্র কোরান 51 অধ্যায়ে আধ ধরিয়াত, 56 নং আয়াতে মানবজাতির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার আগে প্রথমে তাকে চিনতে হবে কারণ জ্ঞান ছাড়া কারো আনুগত্য করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, মানুষকে প্রথমে শিখতে হবে কিভাবে তারা এই কাজটি সম্পন্ন করার আগে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে হয়। তাই জ্ঞানের অনুসরণে পূজা হয়। এ কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরকারী জ্ঞান অন্বেষণকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনই মহান আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করতে পারবে না। জ্ঞানের সাথে সম্পাদিত কিছু ভাল কাজ অজ্ঞতার কারণে ভুলভাবে করা অনেক ভাল কাজের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

যেহেতু মহান আল্লাহ, তিনিই যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া আর কারো সেবা ও উপাসনা করার অধিকার নেই। একজন নিয়োগকর্তা যদি তাদের কর্মচারীকে যে দায়িত্বের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার জন্য

সহজেই বরখাস্ত করে, তবে মহান আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত ত্যাগ করা কীভাবে সঠিক হবে, যখন তিনি একাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন? সমস্ত মানবজাতিকে স্বাধীন ইচ্ছা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায় যে এর মাধ্যমে চিরন্তন পুরষ্কার পাবে নাকি তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং উভয় জগতে শাস্তি ভোগ করবে। একইভাবে একটি ডিভাইস, যেমন একটি মোবাইল ফোন, যা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করে না, বাতিল করা হয় মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বিচারের দিন জাহান্নামে পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ইবাদত বলতে মহান আল্লাহর আনুগত্য বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই আনুগত্য অবশ্যই একজনের জীবন এবং শরীরের প্রতিটি অংশকে ঘিরে রাখতে হবে, যেমন তাদের জিহ্বা। এতে আল্লাহর প্রতি একজন ব্যক্তির কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত, যেমন নামায পড়া এবং সৃষ্টির সাথে সদয় আচরণ করা।

যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে খারাপ শাস্তি পাবে। জামে আত তিরমিযী, 2466 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে তবে তিনি পূর্ণ করবেন। তাদের হৃদয় সমৃদ্ধি এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করুন। কিন্তু যদি তারা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মহান আল্লাহ তাদের জীবনকে সমস্যায় ভরিয়ে দেবেন এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করবেন না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যেভাবেই হোক সৃষ্টির প্রয়োজন করেন না। সহীহ মুসলিম, 6572 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা কেবল তাদের ভাল কাজের দ্বারা উপকৃত হয় কারণ এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ায়। এবং তারা কেবল তাদের পাপের জন্য নিজেদের ক্ষতি করে কারণ তাদের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। মহান আল্লাহ তায়ালার অসীম মর্যাদা মোটেও পরিবর্তিত হয় না তা নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টি তাঁর ইবাদত করুক বা না করুক। মহান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র রিযিকদাতা। এটা মানুষ যারা সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রয়োজন. যে ব্যক্তি এটি বুঝতে পারে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং তাই তাকে চিরন্তন পুরস্কার দেওয়া হবে।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে মহান আল্লাহ তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টের সময়ে তাঁর আনুগত্য করার জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায় সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলমান উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাকওয়ার দিক

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকওয়ার কিছু দিক উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 426-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উল্লিখিত তাকওয়ার প্রথম দিকটি হল মহান আল্লাহকে ভয় করা।

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত করে যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যেটা বেআইনীর কাছাকাছি, তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা এক আকস্মিক পদক্ষেপে নয় ধীরে ধীরে ঘটেছে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক বক্তৃতা না করে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উল্লিখিত তাকওয়ার দ্বিতীয় দিকটি হল ঐশী ওহী অনুযায়ী কাজ করা।

এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির

মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উল্লিখিত তাকওয়ার তৃতীয় দিকটি হল এই পৃথিবীতে অল্প কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকা।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা উল্লিখিত তাকওয়ার চূড়ান্ত দিকটি কার্যত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এটা আশ্চর্যজনক যে যদিও লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে তবুও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা এমন আচরণ করে যেন তারা দীর্ঘ জীবনযাপন করবে। কেউ কেউ এই জড় জগতের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে এমন মাত্রায় উৎসর্গ করে যে তাদের দীর্ঘ জীবনের নিশ্চয়তা পেলেও তারা জড় জগতের জন্য আর কোন প্রচেষ্টা চালাতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানরা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে এই বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে এটি করতে পারবে। তারা প্রায়শই এই প্রস্তুতিতে বিলম্ব করতে থাকে যতক্ষণ না তারা হঠাৎ অপ্রস্তুত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন জীবন এক ঝলকানিতে চলে যায়। তাই তাদের উচিত অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাদের কাছে থাকা প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করেই তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই মনোভাব তাদের এই জগতের বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে এবং পরেরটির জন্যও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে দেয়। একজন মুসলমান শুধুমাত্র পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা এই জড় জগতের আধিক্যের পিছনে ছুটতে থাকে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে নয়।

একজন মুসলমানের সহীহ মুসলিম, 7424 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যা সতর্ক করে যে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাজ তাদের কবরে তাদের সাথে থাকবে যখন তাদের পরিবার এবং সম্পদ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের পরিত্যাগ করবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে।

মুসলমানদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা উচিত নয় অন্যথায় তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে কারণ মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট বয়স বা সময়ে আসে না। তারা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হলে তাদের কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না যখন অনুশোচনা তাদের কোন উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

ঐশ্বরিক আদেশ

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার মন্তব্য করেছিলেন যে স্বর্গে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। এমন কেউ নেই যে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং তাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত দুজন ফেরেশতা নেই যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের কাছে যা আদেশ করেন, তখন তারা আর তাদের মধ্যে দাঁড়ায় না এবং তাদের জন্য যা নির্ধারিত হয়। কেউ সত্যিকারের বিশ্বাস জানে না যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারে যে তাদের যা ঘটেছিল তা কখনই তাদের মিস করতে পারেনি এবং যা তাদের মিস করেছে তা তাদের কখনই হতে পারে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 428-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে

আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

নিজের জীবনে এবং মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে তা স্বীকার করা, মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস হল আল্লাহ, মহান, তাই মুসলমানদের শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

একটি সুন্দর উপদেশ - 4

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 429-430-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে এই দুনিয়া শেষ হয়ে আসছে এবং শীঘ্রই বিদায় নেবে এবং পরকাল আসছে এবং শীঘ্রই শুরু হবে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আশার দিনগুলিতে (আনুগত্যের) কম পড়ে তার মৃত্যু আসার আগে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অসীম এবং সকল পাপকে অতিক্রম করতে পারে। এবং মহান আল্লাহর অসীম করুণার প্রতি আশা ছেড়ে দেওয়াকে অধ্যায় 12 ইউসুফ, 87 নং আয়াতে অবিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

তথাপি, মুসলমানদের জন্য একটি সত্য বোঝার জন্য এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যথা, একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাসের অর্থ সহ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি, একজন মুসলমান অমুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যদি এমন হয় তবে এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় থাকবেন তা উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। এটি তখন ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম পাপের উপর অটল থাকে, বিশেষ করে বড় পাপ, যেমন মদ পান করা এবং তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের

জন্য সচেষ্ট হতে হবে কারণ এটি একটি কাজ যা তারা নিঃসন্দেহে পূরণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের আশা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতারিত করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা হিসাবে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা, তাঁর রহমতের আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা যার কোন ওজন বা তাৎপর্য নেই। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর শাস্তির ভয় থেকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কঠোর পরিশ্রম করার মতো পুরস্কারের আশায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকদেরকে কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান

আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যা এই হাদিসটি নির্দেশ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার প্রত্যাশা করে। এটা সত্য আশা নয় এটা নিছক ইচ্ছাপূরণ চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায় তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময় একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, যদিও তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্য হয়ে কাটিয়েছে, যেমনটি মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় শান্তি ও বরকত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে সত্যের দ্বারা উপকৃত হয় না, মিথ্যা দ্বারা তার ক্ষতি হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন

বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করেন তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়াতে অত্যাবশ্যক কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে প্রকৃতপক্ষে একটি আলো যা একজনকে এই পৃথিবীতে সংগ্রহ করতে হবে যদি তারা পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চায়। একজন মুসলিম যদি গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে দুনিয়াতে এই আলো সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা পরকালে এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা করবে কিভাবে?

সমস্ত মুসলমান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের উপর সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে।

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোনো মুসলমান এই অকল্পনীয় নেয়ামত পেতে চায় তাহলে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য বাস্তবিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি হল যখন একজন ব্যক্তি কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক

আনুগত্য নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর অবাধ্য হয় তাদের জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন।

মনে রাখার বিষয় হল যে বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে আগুনের মুখোমুখি হবে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুন এড়িয়ে চলে, সেভাবে তার পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে গুনাহ গুপ্ত আগুনের মতো যা তাকে পরকালে দেখানো হবে।

এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটা সত্য হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এতটা কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভালো বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু মুসলমান বিচার দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দেয় তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস

হারিয়ে ফেলতে পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একইভাবে বর্ম ও ঢাল ছাড়া যুদ্ধে প্রবেশ করা যাবে না একজন মুসলমানের সৎকর্মের বর্ম ও ঢাল ছাড়া বিচার দিবসে প্রবেশ করা উচিত নয়। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, একইভাবে একজন মুসলমান যে বিচার দিবসে পৌঁছাবে, যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ব্যতীত, যার মধ্যে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। তার নিষেধ এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা তাঁর অবাধ্যতা করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

সুষম খাবার

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কঠোর হৃদয় ভরা পেট থেকে আসে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 436-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

হৃদয়ের প্রতি সামান্য খাবারই কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং কামনা-বাসনার দুর্বলতা ও ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব একটি কঠিন হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করে। কঠিন হৃদয়ের অধিকারী কেয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

সত্যিকারের আভিজাত্য

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে অগ্রাধিকার আসে গুণ এবং উত্তম চরিত্র থেকে, বংশ থেকে নয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 436-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

নিজেকে উপকৃত করুন

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে দয়া হল সর্বোত্তম সম্পদের একটি। যারা এটি প্রত্যাখ্যান করে তাদের অকৃতজ্ঞতার দ্বারা দয়ার কাজ করতে নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। দয়া তিনটি জিনিস ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না: এটি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করা, এটি গোপন করা এবং তা করতে ত্বরান্বিত করা। একটু চিন্তা করলেই এটা দারুণ হয়। লুকিয়ে রাখলে তা নিখুঁত হয়। তাড়াহুড়ো করলে মানুষ এটি উপভোগ করতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 437-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে, তখন নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"...বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

ইসলামকে পরিপূর্ণ করা

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের বিষয়গুলি থেকে বাদ পড়বে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 438-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে যে দায়িত্ব পালন করা হয় তা পালন করার চেষ্টা করা উচিত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের

ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলমানকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গী হওয়া দুনিয়াতে ক্ষতি এবং পরকালে আফসোস। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 438-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। একজন মানুষ যেমন খুশি হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, চাকরির মতো, তারাও তার প্রিয়জনের পরকালের সাফল্য কামনা করবে। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতে, তাহলে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে, নাকি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সামাজিক স্বাধীনতা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন তখন একজন ব্যক্তি যেন সৃষ্টির কারো দাসত্ব না করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 439-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রধান জিনিস যা একজন মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে তা হল মানুষ একটি উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি মানুষ এটা পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তবে তাদের এবং পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা আরও খারাপ হবে কারণ তারা এখনও উচ্চ স্তরের চিন্তাভাবনার অধিকারী, তবুও পশুদের মতো জীবনযাপন করা বেছে নেয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো ব্যক্তির সেবক। কেউ কেউ অন্যের সেবক, যেমন হলিউড এক্সিকিউটিভ এবং তারা যা করতে আদেশ করেন তা করেন এমনকি যদি তা শালীনতা এবং লজ্জাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই করে। অন্যরা তাদের নিজের ইচ্ছার দাস হয়ে আরও খারাপ কারণ এটি এমন প্রাণীদের মনোভাব যারা সাধারণত নিজেকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহান আল্লাহর বান্দা ছিলেন, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল এবং থাকবে। পরের এই মঞ্জুর. শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা বিশেষ করে অন্যের সেবক হয়েছিলেন, তাদের নিজেদের কামনা-বাসনা কিছু পার্থিব মর্যাদা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং তারা ইতিহাসের পাদটীকাতে পরিণত হয়েছিল। মিডিয়া খুব কমই তাদের মনে রাখে যারা রিপোর্ট করার জন্য পরবর্তী ব্যক্তির দিকে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের বেশি সময় ধরে চলে যায়। তাদের জীবনকালে এই লোকেরা অবশেষে দু: খিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে কারণ তাদের আত্মা এবং শালীনতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করে তাদের তৃপ্তি দেয়নি যা তারা খুঁজছিল। এই সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানুষকে যদি বান্দা হতেই হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, কেননা স্থায়ী সম্মান, মহানুভবতা ও প্রকৃত সাফল্য কেবল এতেই নিহিত।

যারা অবিশ্বাস করে বা ইসলামে তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করা এড়িয়ে যায় তারা বস্তুগত জগত এবং এর ভিতরের জিনিসগুলির প্রতি ভালবাসার কারণে তা করে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস করা বা কাজ করা তাদের পার্থিব আশীর্বাদের অর্থ উপভোগ করতে বাধা দেবে, তাদের জন্য বিশ্বাস এমন একটি জিনিস যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে এবং তাই তারা আক্ষরিক বা বাস্তবিকভাবে এটি থেকে দূরে সরে যায়। পরিবর্তে তারা বস্তুজগতের দিকে ঝুঁকছে এবং বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করে এই বিশ্বাস করে যে প্রকৃত শান্তি এতে নিহিত রয়েছে। যারা তাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়িত করে তাদের প্রতি তারা অবজ্ঞা করে। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধার্মিক মুসলমানরা নিচু দাস যাদেরকে নিজেদের ভোগ করা থেকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে অথচ তারা, কাফের এবং বিপথগামীরা স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সত্য থেকে আরও বেশি হতে পারে না কারণ প্রকৃত বান্দা তারাই যারা মহান আল্লাহকে মেনে নিতে এবং আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়

এবং শ্রেষ্ঠ তারাই যারা বিশ্বের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এটি করেছে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। একজন ভাল পিতামাতা তাদের সন্তানের খাবারের ধরণকে সীমাবদ্ধ করবেন যার অর্থ, তারা তাদের শুধুমাত্র একবারে জাঙ্ক এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে দেবেন এবং পরিবর্তে তাদের একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট অনুসরণ করতে বাধ্য করবেন। এই শিশুটি তাই বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা তাদের উপর অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এবং তারা তাদের পিতামাতার এবং তাদের স্বাস্থ্যকর খাবারের দাস হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অন্য একটি শিশুকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা যা ইচ্ছা, যখনই ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা তা খেতে। তাই এই শিশুটি বিশ্বাস করে যে তারা সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যখন এই শিশুরা একত্রিত হয় যে শিশুটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তারা সমালোচনা করে এবং তাদের পিতামাতার দ্বারা সীমাবদ্ধ শিশুটির প্রতি অবজ্ঞা করে। পরবর্তী শিশুটিও নিজেদের জন্য দুঃখ বোধ করবে যখন তারা দেখবে যে অন্য শিশুকে তাদের ইচ্ছামত আচরণ করার জন্য স্বাধীন রাজত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে শিশুটিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে সুখ পেয়েছে যেখানে অন্য শিশুটি জীবন উপভোগ করার জন্য খুব বেশি বিধিনিষেধের সাথে আবদ্ধ। কিন্তু বছরের পর বছর সত্য প্রকাশ পাবে। যে শিশুর কোন বিধিনিষেধ ছিল না তারা বড় হয়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে যেমন স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। এর ফলে তারা মানসিকভাবেও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে কারণ তারা তাদের শরীর এবং চেহারার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে তারা ওষুধ, রোগ, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার দাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত জিনিস তাদের সুখ এবং জীবনকে সীমাবদ্ধ করে। অন্যদিকে, যে শিশুটি তাদের পিতামাতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল সে মন এবং শরীরে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তারা তাদের শরীর এবং ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যা তাদের জীবনে সফল হতে সাহায্য করে। তারা সঠিক ভারসাম্য এবং নির্দেশনার সাথে বড় হওয়ার সাথে সাথে ওষুধ, রোগ, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়। তাই যে শিশুর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না সে অনেক কিছুর দাস হয়ে বেড়ে ওঠে, যেখানে সীমাবদ্ধ শিশুটি সকল বিধিনিষেধ থেকে স্বাধীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

উপসংহারে বলা যায়, প্রকৃত দাস হল সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল জিনিসের দাস হয়ে যায়, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি এবং এর ফলে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, যেখানে প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, যার ফলে মানসিক ও শরীরের শান্তি লাভ হয়।

মানুষের সেরা

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার মানুষের সেরা বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 440-441-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বর্ণনা করেছেন যারা সৎ কাজ করার সময় আশাবাদী হয়।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে

ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, তার মধ্যস্থতায় কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি

মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বর্ণনা করেছেন যারা পাপ করার সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি এই লোকদের বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া , এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ছোটখাট গুনাহগুলো নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় যা অনেক হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 550 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি উপদেশ দেয় যে পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ মুছে ফেলবে। তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহ যতক্ষণ না বড় গুনাহ এড়ানো যায়।

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত ছোট-বড় সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যদি সেগুলি ঘটে থাকে তবে মৃত্যুর সময় অজানা থাকায় অবিলম্বে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বর্ণনা করেছেন যারা পরীক্ষার মুখোমুখি হলে ধৈর্য ধরে থাকে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি যে অসুবিধাগুলি নিয়ে আসে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন যা তাদের ডাক্তার তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে এই বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তবুও, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যা নিয়ে আসে ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তা তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় যদিও তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করে ঠিক যেমন তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞানটি তারা কখনই বুঝতে পারে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে বর্ণনা করেছেন যারা রাগান্বিত হলে অন্যকে ক্ষমা করে দেয়।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা

দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

মুমিনের গুণাবলী

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, একবার একজন মুমিনের কিছু গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 441-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে যখন একজন বিশ্বাসী কোন কিছুর দিকে তাকায়, তখন তারা তা থেকে একটি শিক্ষা নেয়।

একজন মুসলমানের জন্য একটি মূল সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মানুষ এই প্রজ্ঞা অবিলম্বে পালন না করলেও বিজ্ঞ কারণ ছাড়া সৃষ্টির কিছুই ঘটে না। একজন মুসলমানের উচিত যা কিছু ঘটে, সেগুলি সহজে হোক বা অসুবিধার সময়ে হোক, বোতলের বার্তা হিসাবে। বোতলটির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ধরা পড়া উচিত নয় কারণ এটি নিছক একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। এটি তখন ঘটে যখন মুসলমানরা হয় ভাল জিনিসের জন্য উল্লাস করে যা ঘটে থাকে যার ফলে ভাল জিনিসের মধ্যে বার্তার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয় যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণে মনোনিবেশ করা এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

"যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হন..."

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার মাধ্যমে কেউ চরম আবেগ এড়িয়ে চলে যেমন, উল্লাস যা অত্যধিক সুখ বা দুঃখ যা অত্যধিক দুঃখ। এই ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা একজনকে তাদের মনকে বোতলের অভ্যন্তরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ফোকাস করার অনুমতি দেবে, পরিস্থিতির ভিতরে তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার পরিস্থিতি। লুকানো বার্তা মূল্যায়ন, বোঝা এবং কাজ করার মাধ্যমে একজন মুসলমান তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি জাগরণ কল হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর একটি উপায় হবে। অন্য সময় তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় এবং কখনও কখনও একটি অনুস্মারক যাতে নিজেকে সাময়িক বস্তুগত জগতে এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে সংযুক্ত না করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যতীত একজন ব্যক্তি তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করে নিছক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে যখন একজন বিশ্বাসী নীরব থাকে, তখন এটি হওয়া উচিত কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্পর্কে চিন্তা করছে।

নিছক ইবাদত করলে কাউকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের কাছে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এবং তাদের ভাল

বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে অর্জন করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র গুরুতর প্রতিফলন এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

যখন কেউ তাদের নিজস্ব বাস্তবতাকে চিনতে পারে তখন এটি তাদের সেবকের মতো জীবনযাপন করতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করবে। এটি তাদের মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পরিচালিত করবে, যা চূড়ান্ত লক্ষ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই আত্ম-মূল্যায়ন একজনকে তাদের চরিত্র এবং আত্মাকে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য অত্যাবশ্যক, যা উভয় জগতের সাফল্যের পথ। কেউ কেউ বস্তুগত জগতে এতটাই হারিয়ে যায় যে তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে না এবং তাই তাদের এক বিট পরিবর্তন না করেই কয়েক দশক কেটে যায়। দুর্বলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মুসলমানদের অবশ্যই আত্ম-মূল্যায়ন এবং আরও উন্নতির জন্য তাদের দেওয়া শক্তির সময় ব্যবহার করতে হবে। এই মুহুর্তে তারা পরিবর্তন করতে চাইবে কিন্তু তারা তা করার বুদ্ধি বা শক্তির অধিকারী হবে না। এটি সহীহ বুখারী, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অবশেষে এমন একটি সময় এল যখন তাদের শক্তির মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল এবং তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাদের শক্তির মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে আশীর্বাদ করবেন যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তারা সমাজে সম্মানিত হবেন।

যেহেতু মুসলমানদের অধিকাংশই আরবি ভাষা বোঝে না, প্রচুর পরিমাণে ইবাদত এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকে ট্রিগার করবে না। এই জড় জগৎ, মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামকে চিন্তা করেই কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ষাট বছরের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে এক মুহূর্তের প্রতিফলন উত্তম হয়ে উঠতে পারে।

যারা প্রজ্ঞা বা প্রতিফলন ছাড়াই জীবনযাপন করে তারা অভ্যাসগতভাবে ভুল করে যা শুধুমাত্র ক্রমাগত চাপের দিকে পরিচালিত করে। এই লোকেরাই কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছাড়াই লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য না বুঝেই প্রতিটি দিন অতিক্রম করে।

ধার্মিকেরা সর্বদা তাদের দিন থেকে সময় বের করে তাদের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তারা কী কাজ করেছে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে কি না। এই মানসিকতা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পাপ পরিহার করে, সৎ কাজ করে

এবং যদি তারা পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই মানসিকতা ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা ওমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া উপদেশের সাথে খাপ খায়, যা ইমাম আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। বিচার দিবসে অন্য কেউ তাদের বিচার করবে, নাম মহান আল্লাহ।

এই স্ব-মূল্যায়ন হল সেই চাবিকাঠি যা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই মঞ্চের তুলনায় এটি সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে একজন তাদের ভুল বুঝতে পারে যখন অন্য একজন তাদের নির্দেশ করে। কিন্তু এই পর্যায়েও একজনের ভালো বন্ধু এবং আত্মীয়দের থাকা প্রয়োজন যারা জ্ঞানী এবং আন্তরিকভাবে তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে শুধুমাত্র জড় জগতের সাথে উদ্বিগ্ন। একজন সত্যিকারের ধন্য মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কাছে এই ধরনের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে যারা তাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

একজনের দিনের শুরুতে প্রতিফলিত হওয়া এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই কাজগুলি এড়িয়ে সময় বাঁচায় যেগুলি বিলম্বিত হওয়া উচিত।

নিচের আয়াতে সফল মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত না হয় তবে তাদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং

অনেক দেরি হওয়ার আগেই পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 83:

"এবং যখন তারা শোনেন যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে..."

আত্ম-প্রতিফলনের অভাব মুসলমানদের বস্তুজগতে হারিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যদিও ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক সহজলভ্য। স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা শুধুমাত্র একজনকে এতদূর নিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাসের উচ্চতায় পৌঁছতে তাদের অবশ্যই তাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এটি তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই আত্ম-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইসলামী জ্ঞান যা অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে , এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন বিশ্বাসী যখন কথা বলে তখন তারা জ্ঞানের কথা বলে।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

বেনামী সেবক

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আল্লাহর অজানা আন্তরিক বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিটি অন্ধকার পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং তাঁর করুণা লাভের। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 441-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ বেনামী বান্দাকে ভালবাসেন। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি অর্জনের জন্য জাগতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। যেহেতু এটি প্রদর্শনের মতো অনেক পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র একজনের পুরস্কারকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা বিখ্যাত হয়ে যায় তবে তাদের উচিত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন না করে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 5

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 443-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে সর্বোত্তম উপায় যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে তা হল ঈমান।

সত্যিকারের বিশ্বাসের সাথে আন্তরিকতা জড়িত। সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে

তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়ীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ তারা ধর্মের ভিত্তি।

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের

আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"... তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের বাইরে নামাজ আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"...অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলমানকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম না হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

আরেকটি প্রধান সমস্যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় যে তারা বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে ফরজ দান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে ফরজ সদকা দান করতে ব্যর্থ হলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তা থেকে বিরত রাখে তারা যেন কখনই মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একটি সমাজের সদস্যরা বাধ্যতামূলক দানকে আটকে রাখে, মহান আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং যদি এটি পশুদের জন্য না হয় তবে তিনি বৃষ্টিপাত করতে দিতেন না। এই বড় পাপ তাই কিছু জাতির মুখোমুখি দীর্ঘ সময়ের খরার একটি সম্ভাব্য কারণ।

বাধ্যতামূলক দান না করা চরম লোভের লক্ষণ কারণ এটি একজনের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ 2.5%। এটা স্পষ্ট যে কৃপণ আল্লাহ, মহান, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা কেবল তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে না বরং এটি তাদের জীবনে আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় যা তাদের দান করা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিমের ৬৫৯২ নং হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন, দান করলে কারো সম্পদ কমে না। এর অর্থ হল, যখন কেউ দান করে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তাদের ব্যবসার সুযোগ প্রদান করেন যার ফলে তারা দান করার চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করে। এই পরিশোধের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 11:

" কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান?"

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইঙ্গিত করতে পারে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিধান পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে পরিমাণ সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করা হবে তা কখনই পরিবর্তিত হবে না তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি যতই সম্পদ দান করুক না কেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে হবে, তাদের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ বাধ্যতামূলক দানের আকারে দান করে এমন একটি পুরস্কারের আশায় যা দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক বেশি।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে রমজান মাসের রোজা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ এটি মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে সুরক্ষা।

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত সমস্ত সৎ কাজ নিজের জন্য করা হয় কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি তা করবেন। সরাসরি পুরস্কৃত করুন।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস হল একটি অনন্য ধার্মিক কাজ কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ শুধুমাত্র তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত ঈমানদার হবে না কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজাও পূর্ণ না করে তাহলে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। সারাজীবন রোজা রাখলেও সওয়াব ও আশীর্বাদ হারিয়ে যায়।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত রোজা সঠিকভাবে তাকওয়া বাড়ে. অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে

বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন তারা রোজা রাখে এই অভ্যাসটি শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা সত্ত্বেও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবেও রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখা উচিত, এবং এর পরিবর্তে ভাগ্য ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে জানার জন্য নিয়ে আসে, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন যদিও তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং অন্যদের না জানানো যদি এটি পরিহারযোগ্য হয় কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, জনগণকে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ এটি পরিবারের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে এবং একজনের জীবনকে আশীর্বাদ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সময় অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে ভালো সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয় কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্রভাবে এবং তারপরও তাদের সাহায্য করা উচিত যেগুলি ভাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করা উচিত কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদেরকে গোপন দাতব্য দান করার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ এটি পাপের মোচন করে এবং প্রভুর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়।

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটিতে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যিনি গোপন দাতব্য দান করেন। যদিও প্রকাশ্যে দাতব্য দান করা অন্যদেরকে একই কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ ও উত্সাহিত করতে পারে, যা কতজন লোক তাদের আচরণ অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে একজনের পুরষ্কার বৃদ্ধি করে যা সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তবুও, গোপনে দান করা বিপজ্জনক এড়ানো যায়। দেখানোর পাপ, যা একজনের কাজকে ধ্বংস করে দেয়। যখন একজন মুসলমান গোপনে দান করে তখন তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে কতটুকু দান করতে হবে তার সীমা নির্ধারণ করেনি। সুতরাং একজন মুসলমানের কোন অজুহাত নেই যদি তারা এই উপদেশের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় কারণ আল্লাহ, মহান, একটি কাজের অর্থের গুণমান পর্যবেক্ষণ করেন, একজন ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, ইসলামে দান শুধু সম্পদ দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত ভাল কাজকে পরিবেষ্টন করে, যেমন ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ

কাজের নিষেধ। সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নেক আমলগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তি অন্যের কাছে উল্লেখ না করে গোপনে করে থাকে, আশা করা যায় যে তারা এই হাদিসটি পূরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন ছায়া পাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েও মানুষকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ এটি সর্বোত্তম স্মরণ।

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যতটা সম্ভব সফলভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

এই পর্যায়গুলি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

একটি সুন্দর উপদেশ - 6

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 446-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের বলেছিলেন যে তিনি ভয় করেছিলেন যে তারা বাঁকা এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করবে এবং এটি তাদের সত্য ত্যাগ করতে উত্সাহিত করবে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের বলেছিলেন যে তিনি ভয় পান যে তারা দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করবে এবং এটি তাদের পরকাল ভুলে যেতে উত্সাহিত করবে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের

জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার

জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, লোকদের বলেছিলেন যে তিনি ভয় পান যে তারা দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করবে এবং এটি তাদের পরকাল ভুলে যেতে উত্সাহিত করবে। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া শীঘ্রই শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পরকাল শুরু হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে, তাই তারা আখেরাতের সন্তানদের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত, এই দুনিয়ার সন্তানদের মধ্যে নয় কারণ আজকে কোন হিসাব ছাড়াই কাজ করা হচ্ছে এবং আগামীকাল কোন আমল ছাড়াই হিসাব করা হবে।

যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না এই দাবি করে যে তারা ছোট থাকে তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে যার অর্থ, তারা ছুটিতে থাকার মতোই এই পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

জ্ঞানের বাণী – 5

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 447-448 এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে শব্দগুলি তখনই উত্তম যখন তারা কর্মের সাথে থাকে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একটি ভাল নিয়ত না থাকলে কাজগুলি ভাল নয়।

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মুসলিম লোকদের খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের উচিত ছিল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

যদি শয়তান কাউকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে তবে সে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই

সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করে যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটা শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে সম্ভব, যেমন একজনের কথাবার্তা কিভাবে রক্ষা করা যায়।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, উপদেশ দিয়েছেন যে একটি ভাল নিয়ত না থাকলে কাজগুলি ভাল নয়। আর কোন নিয়তই ভালো নয় যদি না তা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী হয়।

মুসলমানদের উচিত নয় অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ ও গ্রহণ করা। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অনুসরণ করবে। এই দিনে এবং যুগে এটি বেশ স্পষ্ট হয় কারণ অনেক মুসলমান অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করেছে যার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের দ্বারা কতগুলি অমুসলিম সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজনকে কেবলমাত্র আধুনিক মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে তা হল যে অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ কারণে অমুসলিমরাও তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনার কিলিং হল একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে এখনও কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করার অভ্যাসের কারণে সমাজে যখনই অনার কিলিং ঘটে তখনই ইসলামকে দায়ী করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে একত্রিত করার জন্য জাতি ও ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন তবুও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চা অবলম্বন করে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের পুনরুত্থিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করবে তত কম তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে।

সুষ্ঠু ব্যবসা নিশ্চিত করা

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, লোকেরা সঠিকভাবে এবং ন্যায্যভাবে ব্যবসা করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করতেন। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য উদ্ধৃত করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চলে যেতেন, লোকেদের কীভাবে ব্যবসা করতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে খারাপ ব্যবসায়িক লেনদেন সংশোধন করতেন। তিনি প্রায়শই বণিকদের সতর্ক করতেন আল্লাহকে ভয় করতে এবং শপথ (তাদের পণ্যের গুণমান নিয়ে) শপথ এড়াতে একটি শপথ জিনিসটি বিক্রি করতে সাহায্য করতে পারে তবে এটি আশীর্বাদকে মুছে ফেলতে পারে। এবং তিনি তাদের সতর্ক করে দিতেন যে ব্যবসায়ীরা মন্দ, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করে এবং তাদের পাওনা পরিশোধ করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 455-456-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, প্রায়শই তার গভর্নরদেরকে বণিকদের উপর কড়া নজর রাখতে পরামর্শ দিতেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে সমস্ত লেনদেন অবশ্যই সহনশীল এবং সহজ-সরল ভিত্তিতে, ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং দামের ভিত্তিতে করা উচিত যা উভয় অংশের জন্যই অন্যায় নয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 615-616-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের বক্তৃতায় সৎ হওয়া উচিত লেনদেনের সমস্ত বিবরণ যারা জড়িত তাদের কাছে প্রকাশ করে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে মুসলমানরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অত্যধিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা না করা। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। একইভাবে, একজন মুসলিম আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করবে না তাদের অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সুদের বিরুদ্ধে সতর্কতা

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র যারা ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী তারাই তাদের বাজারে বিক্রি করবে অন্যথায় তারা সুদ খাবে বা না করুক। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 458-459-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি

ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও

বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন

এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

একজন বিচারকের বৈশিষ্ট্য

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, বিশ্বস্ত, যোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করতেন এবং তার গভর্নরদেরকেও তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার মিশরে তার গভর্নরকে বিচারক হিসেবে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষের মধ্যে সেরা ব্যক্তিকে, যিনি চাপের পরিস্থিতিতে শান্ত ছিলেন, যিনি বিরোধীদের দ্বারা অসন্তুষ্ট হননি, যিনি ভুল করলে তা বঞ্চিত হননি, যিনি সত্যের দিকে ফিরে যেতে লজ্জা পাবে না যখন তারা এটিকে স্বীকৃতি দেবে, যাদের লোভ এবং পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, যারা অন্য সকলের কথা শোনার আগে একটি ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না, যারা তাদের সময় নেয় এবং কঠিন বিষয়ে রায় দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে না। , যিনি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন, যিনি তাকে উল্লেখ করে এবং বিচারের জন্য তার কাছে আসায় বিরক্ত হন না, যিনি এটি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত মামলাটি অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করার জন্য ধৈর্যশীল হন, রায়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে কে সবচেয়ে নির্ধারক? তার মন, যে তার প্রশংসা করলে গর্বিত হয় না এবং পার্থিব জিনিস দ্বারা প্রলুব্ধ না হয়। তিনি গভর্নরকে এমন ব্যক্তির প্রতি উদার হতে বলেছিলেন যাতে তাদের জনগণের প্রয়োজন না হয় বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এবং গভর্নরকে অবশ্যই তাকে সম্মান দেখাতে হবে যাতে গভর্নরের কাছের লোকেরা বিশ্বাস না করে যে তারা বিচারককে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 471-472-এ আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য এক অনুষ্ঠানে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একজন বিচারকের অবশ্যই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে: বস্তুগত লাভের প্রতি আগ্রহের অভাব, সহনশীল প্রকৃতি, তাদের সামনে আসা রায় সম্পর্কে জ্ঞান,

জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করার ইচ্ছা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের দোষারোপকে ভয় না করা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খন্ড 1, পৃষ্ঠা 485-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, একবার এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে রায় দিয়েছিলেন যে তাকে ঘৃণা করেছিল তার বিরুদ্ধে যে তাকে ভালবাসত। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফয়সালা করেছেন, অন্য কিছুর জন্য নয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 487-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের

শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।[1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়।

শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

নিপীড়ন এড়ানো

আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সর্বদা তার কর্মচারীদের অন্যদের উপর জুলুম করা এড়াতে সতর্ক করতেন। তিনি একবার তার একজন গভর্নরকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তাদের আদেশ করেছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহকে এবং সাধারণ জনগণকে নিজের, তার পরিবার এবং তার নিকটবর্তীদের উপর প্রাধান্য দেবেন। যদি সে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে সে জালেম হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহ তার বান্দাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিপক্ষ হবেন। তিনি আরো বলেন, মহান আল্লাহ নিপীড়িতদের প্রার্থনা কবুল করেন এবং তিনি অত্যাচারীদেরকে পাহারাদারের মতো দেখছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 472-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

জ্ঞানের স্তর

আলী ইবনে আবু তালিব তাঁর খিলাফতকালে, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জ্ঞানের সঠিক স্তর অনুসারে জাতির বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অর্থ, পবিত্র কুরআন অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, পূর্ববর্তী খলিফাদের রায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিদ্বানদের পারস্পরিক ঐকমত্য এবং বিরল ক্ষেত্রে স্বাধীন যুক্তি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 473-474-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়াটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একটি ঘটনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআযত বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তাকে বিচারের জন্য মামলা করা হয় তবে তিনি কী করবেন? মুআযত রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি পবিত্র কুরআনে মামলা ও তার বিচার না পান তাহলে কি হবে। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে, যদি তিনি তার রেওয়ায়েতে মামলা ও তার রায় না পান তাহলে কি হবে। মুআযত, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি স্বাধীন

যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যা তাকে খুশি করেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 140-141-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই একজন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন তখনই তারা স্বাধীন যুক্তি বলে একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে তাদের পেশাগত নিরপেক্ষ রায় দিয়ে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

এটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য যে, যদিও ইসলামি সাম্রাজ্যের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যের বিপরীতে ভূমি বা ক্ষমতা লাভ করা লক্ষ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী ভূখন্ডের জনগণকে ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ দেওয়া, যা বিদেশী শক্তি দ্বারা বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যেহেতু ইসলাম একটি বিশ্বাস যা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, তাই তরবারির মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর শাসনাধীন সমস্ত লোকের ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা ছিল তা নিশ্চিত করেছিলেন।

সমস্ত সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর নেতা এবং সৈন্যদেরকে বিজিত ভূখণ্ডের নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করতে এবং পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা একই অধিকার দিয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সকল মুসলমানের কাছে ঋণী, যদিও তারা সম্প্রতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা হয় এবং এর

মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামের ব্যাপক উপকারিতা ও সত্যতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করে। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, মুসলমানরা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার কারণে নাগরিকদের আনুগত্য অর্জন করেছিল।

ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনো ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারকারী অন্য কোনো ধর্মই তার কর্তৃত্বাধীন অন্য ধর্মকে প্রকাশ্যে ও নিপীড়নের ভয় ছাড়াই তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়নি।

আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, দরিদ্র ও অক্ষমদের কর (জিজিয়া) প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে থাকেন, যা ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী অমুসলিমরা সরকারকে প্রদান করবে। রাষ্ট্র যখন ইসলামী অঞ্চলে বসবাসরত অমুসলিমদের মৌলিক জনসেবা প্রদান ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় তখনও এই কর নেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু বক্কর (রা.)-এর খিলাফতের সময়, যখন মুসলিম বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় পিছু হটতে বাধ্য হয়, যা শেষ পর্যন্ত ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, কর। সিরিয়ার অমুসলিমদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া এলাকাগুলো যেগুলো মুসলিমরা প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেগুলো জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পদ ফেরত পাওয়ার সময় লোকেরা মন্তব্য করেছিল যে তারা আশা করেছিল যে মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে এবং তাদের কাছে ফিরে আসবে কারণ মুসলমানরা তাদের সাথে রোমানদের চেয়ে ভাল আচরণ করেছিল। রোমানরা তাদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে যেত এবং তাদের কিছুই না রেখে চলে যেত, অথচ, যুদ্ধের সময়ও মুসলমানরা তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দিত। অমুসলিমরা যখন বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে তাদের ভূমি রক্ষায় অংশগ্রহণ করত তখনও কর নেওয়া হত না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 204-205 এবং 444-446-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আখেরাত কামনা করা

আলী ইবনে আবু তালিব এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি হওয়ার পর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং অনৈক্য কেবলমাত্র আলীর জন্য বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান কারণ লোকেরা তাকে মানতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি জাতি তখনই সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে যখন তারা সঠিক দিকনির্দেশনা চায়। যদি তারা এটা কামনা না করে, তাহলে কোন ব্যক্তি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 609-611-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মনে হয় তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় ঠেলে দিতে চাননি। তিনি ইসলামের সাথে আপস করার চেয়ে মৃত্যুকে পছন্দ করতেন।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে

এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর শাহাদাত

দ্য এন্ড

আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন। কিছু রিপোর্ট এমনকি ইঙ্গিত করে যে তিনি জানতেন যে হত্যাকারী কে ছিল, বিদ্রোহী আব্দুর রহমান ইবনে মালজাম। যখন তাকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য বলা হয়েছিল, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ ইবনে মালজাম এর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো কিছু করেননি। ইবনে মালজাম এবং তার দুষ্ট বন্ধুরা নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত তাদের বিপথগামী ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আলীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইবনে মালজাম এবং অন্য দু'জন একটি চুক্তি করেছিল যে তারা পৃথক হবে এবং প্রত্যেকে আলী, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আমর ইবনে আল আসকে হত্যা করবে।

ইবনে মালজাম এবং কিছু সহযোগী আলীর বাড়ির বাইরে লুকিয়ে ছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। পরে যখন ভোরের জামাতের নামাজের ইমামতি করতে আবির্ভূত হয় তখন ইবনে মালজাম তাকে আক্রমণ করে এবং মারাত্মকভাবে আহত করে। ইবনে মালজামকে গ্রেফতার করে আলী (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। ইবনে মালজাম স্বীকার করেছেন যে আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, সর্বদা তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু সাহসের সাথে বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তার তরবারি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিকে হত্যা করবে। আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তার তরবারি নিজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, কারণ তিনি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি ছিলেন। আলী, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট,

আদেশ দিয়েছিলেন যে ইবনে মালজামের সাথে বন্দী অবস্থায় ভাল আচরণ করা হবে এবং যদি সে তার ক্ষত থেকে মারা যায় তবে তাকে আইনগত প্রতিশোধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত তবে তাকে নির্যাতন করা উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামে নিষিদ্ধ ছিল।

ইবনে মালজামের সাথে কাজ করা অন্য দুই ব্যক্তি একই রাতে তাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে রওনা হয়। তাদের মধ্যে একজন মুয়াবিয়াকে আহত করেছিল, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তিনি পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তৃতীয়জন আমর ইবনুল আস মনে করে অন্য একজনকে আক্রমণ করে হত্যা করে। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিন অসুস্থ ছিলেন এবং অন্য কাউকে ফজরের জামাতের নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই লোকটিই ভুলবশত নিহত হয়েছিল।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তিনি কখনই একজন উত্তরসূরি নিযুক্ত করেননি কারণ তিনি মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন এবং জনগণকে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 611-618 এবং 621-625 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

চূড়ান্ত শব্দ

তাঁর মৃত্যুশয্যায় আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদের নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 618-622-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মহান আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান জানান।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয়

যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের কাছে পার্থিব বিলাসিতা না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে উপলব্ধ হয় এবং তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা পার্থিব ক্ষতির জন্য কাঁদবে না।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা

হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাদের সর্বদা সত্য কথা বলার পরামর্শ দেন।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা

ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ

এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাদেরকে এতিমদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং দুস্থদের সাহায্য করার পরামর্শ দেন।

এই দিন এবং যুগে এতিমদের সাহায্য করা খুবই সহজ কারণ কেউ তাদের সান্নিধ্যে না গিয়ে দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তাদের সমর্থন করতে পারে। একজন মুসলমানের জানা উচিত যে, সহীহ বুখারি, 5304 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের দেখাশোনা করবে সে মহানবী (সা.) এর সান্নিধ্যে থাকবে। জান্নাতে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এই হাদিসটিই একজন মুসলিমের পক্ষে এতিমদের সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত কারণ এর খরচ খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ লোকেরা তাদের মাসিক ফোন বিলে বেশি অর্থ ব্যয় করে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অন্তত একজন এতিমকে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং অন্যকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এর মধ্যে শুধু আর্থিক সাহায্য নয় অন্যদের সাহায্য করার সব ধরনের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের যেকোনো ধরনের বৈধ প্রয়োজন নিজের শক্তি অনুযায়ী পূরণ করা উচিত এবং যদি কোনো মুসলমান দেখতে পায় যে তারা এই সাহায্য প্রদান করতে পারে না, তাহলে তাদের উচিত একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে নির্দেশ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্যকারীর মতো একই পুরস্কার পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে

অবশ্যই অন্যদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে তাদের উপকার হয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাদের প্রয়োজনের সময় আটকা পড়ে যেতে পারে।

মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, যাতে তারা আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এর একটি দিক হল ভালো উপদেশের মতো যা কিছু আছে তা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করা।

একজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা উচিত যা তাদের গর্বিত হতে বাধা দেবে। যথা, তারা অভাবীকে যে সাহায্য দেয় তা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তাই তাদের অবশ্যই প্রকৃত মালিকের ইচ্ছানুযায়ী গরীবদের সাহায্য করার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, দরিদ্ররা তাদের সাহায্যকারীকে একটি উপকার করছে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। প্রয়োজনে কেউ না থাকলে মানুষ অনেক পুরস্কার লাভের এই পদ্ধতিটি হারিয়ে ফেলত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার পরামর্শ দেন।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া

হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করার সময় একজন সমালোচকের দোষকে ভয় না করার পরামর্শ দেন।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়। .

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের অন্যদের ক্ষমা করার পরামর্শ দেন।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা

ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের

দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের ক্রোধ দমন করার পরামর্শ দিলেন।

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে পাপের দিকে নিয়ে না যায়। উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য। এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ায় সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা পরামর্শ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে

উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ

এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাদের পরামর্শ দেন যে তারা কখনই ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ বন্ধ করবেন না।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল , মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের সত্যতা যাচাই করার পরামর্শ দেন।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে অসত্য খবরের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একটি দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয় যা এখনও অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই বিষয়ে অমনোযোগী এবং এটি যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে তথ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি মুসলমানদের কীভাবে প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা শুধুমাত্র সমাজে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে যাচাই করা তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয় না তা জেনেও তারা ত্যাগ করবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের ভাল প্রতিবেশী হতে উপদেশ.

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি প্রতিবেশীদের সাথে এমনভাবে সদয় আচরণ করতে উত্সাহিত করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী প্রত্যেক মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও এই দায়িত্বটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা একজন মুসলমানের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশটি ঘরের মধ্যে বসবাস করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই এর গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করা। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়?

প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহারের সময় একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী সেই যে ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে দেয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলমানের উচিত সবসময় প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের ভাল আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার উপদেশ.

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত

প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

আলী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তাদের তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার পরামর্শ দেন, যাতে মহান আল্লাহর কাছে তাদের হিসাব করা সহজ হয়।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না । যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন

তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা

তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

"...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

"সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না যে মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অ - মুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা। সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়দের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে

চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

আলী, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপর তাদেরকে মহান আল্লাহর ঘরের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং কখনই তা পরিত্যাগ করবেন না।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় পরস্পরকে সহযোগিতা করার এবং পাপ ও সীমালঙঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা না করার পরামর্শ দেন।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করলে সমাজের দ্বারা ভুলে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান শুধুমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল ৬৩ বছর, যখন তিনি শহীদ হন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বক্কর ও উমর ইবনে খাত্তাব রা. সবাই চলে গেল এই পৃথিবী থেকে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 626-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি সূক্ষ্ম বর্ণনা

আলী ইবনে আবু তালিবের শাহাদাতের পর, তার পুত্র হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত কথা দিয়ে জনগণকে সম্বোধন করেছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 627-এ আলোচনা করা হয়েছে। .

হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, গতকাল এমন এক ব্যক্তি চলে গেছেন, যিনি জ্ঞানের দিক থেকে প্রথম দিকে অগ্রসর হননি এবং পরবর্তীরাও তাঁকে ধরতে পারবেন না।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো

সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সেন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অভিযানে তাঁকে তাঁর পতাকা দিয়েছিলেন এবং বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ ছেড়ে দেবেন না। তাকে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বেতন থেকে 700টি রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্য রেখে যাননি যা তিনি তাঁর পরিবারের জন্য একজন চাকর কেনার জন্য ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

একটি সত্যবাদী প্রশংসা

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার দিরার আস সাদাইকে আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর বর্ণনা দিতে বলেছিলেন। দিরার উত্তর দিয়ে বলেছিলেন: "আলি, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, দূরদর্শী এবং শক্তিশালী ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। আদেশ করার সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। জ্ঞান তার ব্যক্তি থেকে প্রবাহিত. বুদ্ধি তার জিহ্বায় কথা বলেছে। তিনি এই পৃথিবীর অলঙ্কার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, নির্জন রাতে সান্ত্বনা নেন। তিনি প্রার্থনায় অনেক কেঁদেছিলেন, গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে উপদেশ দিতেন এবং অন্যের উপর হাত ঘুরিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ খাবার এবং সাদামাটা পোশাক পছন্দ করতেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজন হিসাবে বসবাস করতেন, যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন উত্তর দিতেন এবং যখন প্রশ্ন করা হয় তখন উত্তর দিতেন। কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, আমরা শ্রদ্ধার সাথে তার কাছে আসতাম, তাকে একটি নৈমিত্তিক কথোপকথনের জন্য ডাকতে দ্বিধাবোধ করতাম। তিনি ধার্মিকদের সম্মান করতেন এবং দরিদ্রদের প্রতি সদয় ছিলেন। ক্ষমতাবানরা অনুকূল শাসনের উপর অনুমান করার সাহস করেনি এবং দুর্বলরা কখনই তার ন্যায়বিচার থেকে নিরাশ হয় না। আমি তাকে একবার দেখেছিলাম যখন রাত তার পর্দা নামিয়ে দিয়েছিল এবং তারাগুলি অস্তমিত হয়েছিল। তিনি দাড়িতে হাত রেখে প্রার্থনার জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন, এমন একজনের মতো লিখেছেন যাকে সাপে দংশন করা হয়েছে। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: “হে বিশ্ব! আমি ছাড়া অন্য কাউকে প্রলুব্ধ করুন! তুমি কি আমাকে পটাতে এসেছ? এটা কি তুমি আমার জন্য আকুল? দূর হোক! দূর হোক! আমি তোমাকে তিনবার তালাক দিয়েছি, এমন একটি তালাক যা পুনর্মিলনের অনুমতি দেয় না। আপনার জীবন সংক্ষিপ্ত, আপনি সামান্য মূল্য. হায়রে! আমার বিধান দুষ্প্রাপ্য, দূরত্ব দীর্ঘ এবং যাত্রা একাই করতে হবে!”

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কাঁদলেন এবং জবাব দিলেন: "আল্লাহ, মহান, আলীর প্রতি রহম করুন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, সত্যিই তিনি ছিলেন আপনি যেমন বর্ণনা করেছেন!"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 628-629-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

যখন কেউ আলী এবং অন্যান্য সাহাবীদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন এটি স্পষ্ট যে তাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং মতের পার্থক্য ছিল পবিত্র কুরআনের তাদের বৈধ এবং যোগ্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। ফলস্বরূপ তারা সকলেই তাদের বিচারের জন্য পুরষ্কার পাবে। এটি সহীহ মুসলিমের 4487 নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হলে তাদের কারও সমালোচনা করার অধিকার কারও নেই। , মহান আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 100:

"এবং মুহাজিরগণ [মক্কার সাহাবী] এবং আনসার [মদিনার সাহাবীদের] মধ্যে [ঈমানে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সদাচরণে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় প্রাপ্তি।"

যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তার কাফের হওয়ার ভয় থাকা উচিত, যেমন কাফেররা সাহাবীদের অপছন্দ করে, পবিত্র কুরআন অনুসারে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 29:

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তার সাথে যারা [সাহাবায়ে কেরামগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট হন] তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জোরদার, নিজেদের মধ্যে দয়ালু। আপনি তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও [তাঁর] সন্তুষ্টি কামনা করে রুকু ও সিজদা করতে দেখেন। সিজদার প্রভাব [অর্থাৎ নামায] থেকে তাদের চেহারায় তাদের চিহ্ন। তাওরাতে তাদের বর্ণনা রয়েছে। এবং ইঞ্জিলের মধ্যে তাদের বর্ণনা এমন একটি উদ্ভিদের মতো যা তার শাখাগুলি তৈরি করে এবং তাদের শক্তিশালী করে যাতে তারা দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ডালপালাগুলির উপর দাঁড়ায়, বীজ বপনকারীদের খুশি করে - যাতে তিনি [অর্থাৎ, আল্লাহ] তাদের দ্বারা ক্রুদ্ধ হন [সাহাবীগণ, আল্লাহ হতে পারেন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট] কাফেররা..."

যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করে সে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তিনটি সফল দলের মধ্যে পড়ে এবং তাই উভয় জগতেই ধ্বংস হয়। প্রথম দল হলেন সাহাবীগণ যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 8:

“...দরিদ্র মুহাজিররা যারা তাদের বাড়িঘর এবং তাদের সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং [তাঁর] অনুমোদন কামনা করে এবং [আল্লাহ ও তাঁর রসূলের] [কারণ] সমর্থন করে [একটি অংশও রয়েছে]। তারাই সত্যবাদী।"

দ্বিতীয় দল হল মদিনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 9:

“...যারা গৃহে [মদিনায়] বসতি স্থাপন করেছিল এবং তাদের পূর্বে বিশ্বাস [গ্রহণ করেছিল]। তারা তাদের ভালোবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করেছে এবং তাদের (অর্থাৎ, হিজরতকারীদের) যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তাদের বুকের মধ্যে কোন অভাব খুঁজে পায় না, তবে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা একান্তে থাকে। আর যে ব্যক্তি তার আত্মার কৃপণতা থেকে রক্ষা পাবে, তারাই সফলকাম হবে।”

চূড়ান্ত সফল দল হল তারা যারা মক্কা ও মদিনার সাহাবীদের প্রতি কোন নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করে না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং বরং তারা তাদের ইচ্ছা-অনুরাগী। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"...যারা তাদের পরে আসে এবং বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে [কোনও] বিরক্তি রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি অবশ্যই দয়ালু ও দয়ালু।""

যে কেউ সাহাবায়ে কেরামকে অপছন্দ করে এবং সমালোচনা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তিনি এই তিনটি সফল দলের বাইরে পড়েন এবং তাই উভয় জগতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

যে ব্যক্তি আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসে, সে প্রকৃত ঈমান প্রতিষ্ঠা করেছে; যে ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ভালোবাসে , সে স্পষ্ট ও সঠিক পথ বেছে নিয়েছে, যে ব্যক্তি উসমান ইবনে আফফানকে ভালোবাসে, সে মহান আল্লাহর নূর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আলী ইবনেকে ভালোবাসে। আবু তালিব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, দৃঢ় হাত ধরেছেন এবং যে ব্যক্তি সকল সাহাবীকে ভালবাসে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সে মুনাফিক মুক্ত।

উপরন্তু, সন্দেহ ও আকাঙ্ক্ষার পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করে বিদ্রোহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শিখে এবং আমল করে এবং এর ফলে ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিক পথে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পথে অটল থাকবে। আশা করা যায় যে যারা আন্তরিকভাবে তাদের পথে চলে সে পরকালে তাদের সাথে শেষ হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

" আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারা উত্তম।"

তদুপরি, আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর বরকতময় জীবন অধ্যয়ন করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ

করেছিলেন। তিনি কার্যত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং অনুসরণ করে তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার ইচ্ছার উপযোগী আদেশ বাছাই করেননি, বরং তিনি মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত ছিলেন। তাঁর একক লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ এই মহৎ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই মনোভাব তাকে আধ্যাত্মিকভাবে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এবং তিনি আধ্যাত্মিকভাবে পরকালের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এর জন্য কার্যত প্রস্তুতির জন্য তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম দলে পরিণত করেছিল। এই সত্যটি ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর, হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল আসফিয়া, বর্ণনা 278-এ আলোচনা করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। , তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, যাতে তারাও উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করে।

উপরন্তু, তার জীবন অধ্যয়ন করলে, এটি স্পষ্ট যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছেনি। সাহাবায়ে কেরামের রক্ত, অশ্রু, ঘাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে তারা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত, এই সত্যটি আজ মুসলমানদের দ্বারা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, কারণ ইসলামের শিক্ষাগুলি আজকাল খুব সহজলভ্য। কেউ কল্পনা করতে পারেন যে আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, কতটা হতাশ হবেন যদি তিনি দেখতে পান যে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারে। নিঃসন্দেহে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের ত্যাগের জন্য তাদের পুরস্কার পাবেন কিন্তু মুসলমানদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের কাছে ঋণী। এই স্বীকৃতি কেবল কথায় নয় কর্মে দেখাতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা ও আমল করা জড়িত। এটিই একমাত্র উপায় যা একজন সাহাবায়ে কেরামকে স্বীকৃতি, সম্মান এবং ভালবাসেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কাজ ছাড়া কথা ভালোবাসার চেয়ে ভণ্ডামীর কাছাকাছি।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করতে খুব ব্যস্ত বলে তাদের খুব কমই চেনেন। , অক্ষর এবং শিক্ষা. কীভাবে একজন সত্যিকারের মানুষকে ভালবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন তারা বিচারের দিন কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ তাদের জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষার উপর অধ্যয়ন এবং অভিনয়। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ

সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

সম্পূর্ণ অডিওবুক - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1Vizm7rRKaK5Vk9IdVBnpLLolh0dhYG

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
eBooks/AudioBooks-এর জন্য ব্যাকআপ সাইট:
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক: https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

Achieve Noble Character